বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কঃ ১৯৭১-১৯৭৫

আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন[*]
এ.কে. এম. গোলাম রব্বানী[**]

সার সংক্ষেপঃ প্রাচীন কাল থেকে মূলত: বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশের সংগে আরবদের সর্ম্পক গড়ে ওঠে এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে মুসলিম উম্মাহর ধারনার ভিত্তিতে উভয় দেশের সংগে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তানের দু'অংশের জনসংখ্যার ৫৬% বাঙালি এবং মুসলমানদের বড় অংশের পূর্বাঞ্চলের (বাংলাদেশ) অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার বিপক্ষে সৌদি আরবের অবস্থান বাঙালিদের জন্য ছিল বিপন্ন বিস্ময়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন, সৌদি আরবের পাকিস্তান পন্থী নীতির কারণে বাংলাদেশের সংগে সম্পর্ক খুব একটা স্বাভাবিক পর্যায়ে পৌঁছতে পারে নি। যদিও বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমলে সৌদি আরব ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লাভ করে এবং সৌদি আরবের স্বীকৃতি মুজিব আমলের শেষ দিকে কেবল আনুষ্ঠানিকতা মাত্র এ পর্যায়ে পৌঁছে। তবে এই স্বীকৃতি এসে পৌঁছে শেখ মুজিবের মৃত্যুর একদিন পর। যদিও এর প্রেক্ষাপট ও যাবতীয় কূটনৈতিক তৎপরতার সূত্রপাত মুজিব আমলেই সম্পন্ন হয়।

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুজিব আমলে কীভাবে বৈরী সম্পর্ক স্বাভাবিক সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে তারই ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এবং এ ক্ষেত্রে ৬টি দিক আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমত: বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের রাজনৈতিক গুরুত্ব , দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের সংগে আরব বিশ্বের ঐতিহ্যগত সংযোগ, তৃতীয়ত: মুক্তিযুদ্ধে সৌদি আরবের ভূমিকা, চতুর্থত: স্বাধীনতা পরবর্তী সৌদি আরবের প্রতি বাংলাদেশের বৈরী মনোভাবের কারণ, পঞ্চমত: দু'দেশের সম্পর্কের নির্ধারক এবং সব শেষে দু'দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আনা হয়েছে। উপসংহারে কীভাবে সৌদি সম্পর্ক এ আমলে প্রভাব ফেলেছে, বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় নির্ধারকের প্রভাব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে।

ভূমিকা

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিবাদ নীতি অনুসরণের কথা ঘোষণা করে। শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে এসে তাঁর

---

[*] সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

[**] সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বক্তৃতা ও সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট ঘোষণা করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি হবে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বিদ্বেষ নয়।[1] তিনি একই সাথে ঘোষণা করেন বাংলাদেশকে আমি প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ডে পরিণত করতে চাই।[2] ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংবিধানে তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটে এবং পারস্পরিক সার্বভৌমত্ব ও সমতার ভিত্তিতে সকল রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক স্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়।[3] বাংলাদেশ তাই নিজস্ব জাতীয় স্বার্থেই মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বনকারী দেশগুলোর পাশাপাশি বিরোধিতাকারী দেশগুলোর কাছেও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, পাকিস্তানের বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী অপপ্রচার, বিশেষত শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলমান অধ্যুষিত বাংলাদেশের মানুষের সৌদি আরবের সংগে সুসম্পর্কের আকাংখা বাংলাদেশ সরকারকে সৌদি আরবের সংগে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী করে তুলে। অন্যদিকে সৌদি পররাষ্ট্রনীতিতে মুসলিম দেশের সংগে সম্পর্ক স্থাপন সকল সময়ই প্রাধান্য লাভ করে থাকে।[4] পঞ্চাশের দশক থেকে এই নীতির ভিত্তিতে সৌদি পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হচ্ছে এবং এ উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের উদ্যোগে ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন সংস্থা গড়ে উঠে। যদিও বাংলাদেশের আন্তরিকতা সত্বেও পাকিস্তানি অপপ্রচার, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র সংযোজনের কারণে স্বাধীনতার পরও সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিরোধিতা করতে থাকে। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হয়েও বাংলাদেশ সৌদি আরবসহ রক্ষণশীল মুসলিম দেশগুলোর কাছে একটি অবাঞ্ছিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইরান, তুরস্ক ও রক্ষণশীল আরব রাষ্ট্রগুলো পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ লাভে চীনের ভেটো প্রয়োগ সমর্থন দেয়। অবশ্য ১৯৭২ সালের মার্চের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহার, ১৯৭৩ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের সময় বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য এবং আরব বিশ্বের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন, ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশের আরব বিশ্বের স্বার্থে নীতি অবস্থান গ্রহণ, মুজিব সরকারের কূটনৈতিক উদ্যোগ, বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি(১৯৭৪), ওআইসির সদস্য পদ লাভ (১৯৭৪) এবং সর্বোপরি জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের (১৯৭৪) ফলে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির এই প্রেক্ষাপটেই শেখ মুজিবের শাসনামলে রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র বহাল রেখেই বাংলাদেশ ৩৪ টি মুসলিম এবং ওআইসিভুক্ত রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে (পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)। যদিও সৌদি আরবসহ বেশ কটি মুসলিম দেশ তাঁর সময়ে স্বীকৃতি দেয় নি।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিবের হত্যাকান্ড এবং তাঁর সরকারের পতনের পর ঐদিনই পাকিস্তান সরকার খন্দকার মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয় এবং পরের দিন সৌদি আরব বাংলাদেশ ও নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। যদিও একথা ঠিক, এই স্বীকৃতির প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল শেখ মুজিবের আমলেই। এ আমলে সৌদি আরবের সংগে ব্যাপক কূটনৈতিক যোগাযোগ, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে ১৯৭৩ পরবর্তীতে মুসলিম বিশ্বের সংগে ঘনিষ্ঠতা, অভ্যন্তরীণ নীতিতে কিছু পরিবর্তন (যেমন ইসলামী ফাউন্ডেশন পুনঃপ্রতিষ্ঠা), সর্বোপরি সৌদি আরবের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, সৌদি আরবের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করেছে। আর মুজিব আমলে সৌদি স্বীকৃতি ছিল তাই সময়ের ব্যাপার মাত্র। মুজিব আমলের (১৯৭১-১৯৭৫) পুরো সময়কাল ব্যয় হয়েছে সৌদি স্বীকৃতির জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগে। যার ফলে এসময় অন্য কোন সম্পর্ক যেমন কূটনৈতিক মিশন প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পক রচিত হয় নি।

বর্তমান প্রবন্ধে বাংলাদেশ-সৌদি সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৭১-৭৫ সালের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা হবে। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমলে এই সম্পর্ককে প্রাধান্য দেয়া হচ্ছে এ কারণেই যে, সম্পর্কের প্রেক্ষাপট এবং পরবর্তী সরকারগুলোর দু'দেশের সম্পর্ক এসময়ের নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। প্রবন্ধে ৬টি প্রধান দিকের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে, প্রথমত: বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব, দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশের সংগে আরব বিশ্বের ঐতিহ্যগত সংযোগ, তৃতীয়ত: মুক্তিযুদ্ধে সৌদি আরবের ভূমিকা, চতুর্থত: স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করার কারণ, পঞ্চমত: দু'দেশের সম্পর্কের নির্ধারকসমূহ এবং ষষ্ঠত: বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ইস্যু সমূহ আলোচনা।

বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব

কোন একটি দেশের বা এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের রাজনৈতিক গুরুত্বের ওপর সেই দেশের আর্ন্তজাতিক তাৎপর্য অনেকাংশে নির্ভর করে এবং এই বিবেচনার ভিত্তিতেই সেই দেশের প্রতি অন্য একটি দেশ তার নীতি নির্ধারণ করে। বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশের ভৌগোলিক গুরুত্ব প্রসংগে বলা যায় উপমহাদেশের রাজনৈতিক গুরুত্ব ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিক থেকেই স্বীকৃতি পায় । প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করেছে এই উপমহাদেশ ও বাংলাদেশ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার রাজনীতিতে তাই এই

এলাকার ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়।[৫] ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাকিস্তান সৌদি আরবের বিবেচনায় বিশেষ স্থান দখল করে নেয়। হিন্দু ভারতের দ্বারা পরিবেষ্টিত পাকিস্তানের দু'অংশের অবস্থান মুসলিম উম্মাহ'র সংহতিকামী সৌদি আরবকে স্বভাবতই আকৃষ্ট করে। এছাড়া এ দুটি অংশের জনসংখ্যার বড় অংশের ধর্ম ইসলাম তাদের কাছে ছিল বিবেচ্য বিষয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে পাকিস্তান আমলে সৌদি পণ্য আমদানীর একটি বড় অংশ পাকিস্তানের উভয় অংশ থেকে সরবরাহ হতো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে মুসলিম উম্মাহর ধারনা থেকে সৌদি আরব বাংলাদেশকে বিবেচনা করে এবং সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখায়; যদিও পাকিস্তানের কারণে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কিছু সীমাবদ্ধতা ক্রিয়াশীল ছিল।

বাংলাদেশের দিক থেকে সৌদি আরবের ভূরাজনীতি সম্পর্ক স্থাপনে অনুপ্রাণিত করে। সৌদি আরব, আরব বদ্বীপের $\frac{৪}{৫}$ ভাগ বেষ্টিত করে রেখেছে। এর পশ্চিমে লোহিত সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর এবং পূর্বে আরব ভূখন্ড। সৌদি আরবের উত্তরে জর্ডান, ইরাক, কুয়েত, পূর্বে উপসাগরীয় অঞ্চল বাহারাইন, কাতার ও ইউএই(দুবাই, আবুধাবী, সারজাহ, বাসআল- গাইমাবু, ফুজাইরাহ, উমউল কয়াইন ও আখমান), দক্ষিণে ওমান ও দুই ইয়েমেন (উত্তর ও দক্ষিন) এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর।[৬] প্রকৃতপক্ষে আফ্রিকা ও এশিয়ার মূল ভূখন্ডের কাছাকাছি অবস্থান, সুয়েজ খাল, লোহিত সাগর ও আরব ভূখন্ডের নৈকট্যতাই সৌদি আরবের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে সৌদি আরবের প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন- তেল, গ্যাস, স্বর্ণ এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে।[৭] মুসলমানদের তিনটি পবিত্রভূমির মধ্যে মক্কা ও মদিনা, সৌদি আরবে অবস্থানের ফলে এবং সামর্থবান মুসলমানের জন্য হজ্জ্ব ফরজ (আবশ্যক) হওয়ায় বাংলাদেশের কাছে সৌদি আরবের বিশেষ আবেদন রয়েছে।

বাংলাদেশের সংগে আরব বিশ্বের ঐতিহ্যগত সংযোগ

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আরবদের সংগে ভারতবর্ষের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা হয়। বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় কারণে আরবদের এদেশে আগমণ ঘটে। খোলাফায়ে রাশেদিনের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) শাসনামলে (৬৩৪-৬৪৪খৃঃ) হযরত মাহমুদ ও হযরত মোহাইমিনের নেতৃত্বে এক দল দরবেশ ও সূফি এদেশে আসেন।[৮] তাঁরা বিভিন্ন গ্রামীণ জনপদে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। অবশ্য

উমাইয়া শাসনামলে (৬৬১-৭৫০ খৃ:) ভারতবর্ষের সংগে বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় যোগাযোগ আরো প্রসার ঘটে। এই শাসনামলেই ভারতীয় সীমান্ত পর্যন্ত আরব সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। উমাইয়া খলিফা আল ওয়ালিদের শাসনামলে ৭১১ খৃঃ সেনাপতি মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু অধিকারের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সংগে প্রথমবারের মতো আরবদের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এর ফলে পারস্পরিক বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও জোরদার হয়। সে সাথে দু'টি ভিন্নমূখী ধর্ম ও সভ্যতার সম্মিলনে ভিন্নতর সংস্কৃতির সৃষ্টি হয় এবং আর্য ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রনে এক নতুন সত্ত্বার উদ্ভব ঘটে। যারা পরবর্তীকালে ইন্দো-সারসেনী সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক রুপে খ্যাতি অর্জন করে। এর পর থেকে সুলতানী আমল (১২০৬-১৫২৬ খৃ:) এবং মুঘল আমলে আরবদের সংগে ভারতবর্ষের যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।

মুলত আট শতকে বাংলাদেশের চট্টগ্রামে ও নোয়াখালীতে আরব বণিকদের আগমণ ঘটে এবং তাদের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়। নবম শতক থেকে দরবেশ ও সুফিদের বাংলায় আগমন অব্যাহত থাকে। চট্টগ্রামে বায়জিদ বোস্তামী(মৃত্যু চট্টগ্রাম ৮৭৪) শাহ সুফী সুলতান বলখী মাহী সারওয়ার (১০৪৭ সালে সন্দীপ আসেন এবং বগুড়ায় মহাস্থানগড়ে স্থায়ী আস্তানা স্থাপন করেন), বাবা আদম (মুন্সীগঞ্জ), হযরত শাহ জালাল (সিলেট), মীরন শাহ (নোয়াখালী) শেখ ফরিদউদ্দিন (ফরিদপুর), শাহ দৌলা শহীদ (শাহজাদপুর), শেখ শরফুদ্দিন প্রমুখ ইসলাম ধর্ম প্রচার এবং বাংলাদেশের সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন। এসব সুফি সাধকদের অনেকেই বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং স্থানীয় জনমানসে ব্যাপক পরিবর্তনের সূচনা করেন।

অবশ্য সুফি সাধকদের এই ইসলাম ধর্ম প্রচারাভিযানে পরিপূর্ণতা লাভ করে তের শতকে মুসলমান বিজেতাদের বাংলা অভিযানের মাধ্যমে। ১২০২ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির বাংলা অভিযানের মাধ্যমে বাংলায় মুসলিম শাসনের সম্ভাবনার দ্বার উম্মোচিত হয়। তের শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব থেকে বহু আলেম, মুজাহিদ ও সুফি বাংলায় আসেন। সতের শতক পর্যন্ত আগত এই সুফী ও দরবেশদের প্রভাবে বাংলার ব্যাপক অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।

বাংলাদেশের সংগে সৌদি আরবের প্রথম সুদুর প্রসারী যোগাযোগ ঘটে ফরায়েজী আন্দোলনের কর্ণধার হাজী শরীয়তউল্লাহর (১৭৮১-১৮৪০ খৃ:) মাধ্যমে। ১৭১৮ সালে তিনি হজ্জ্ ব্রত পালনের জন্য সৌদি আরব যান এবং

ইসলাম, প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানের উপর শিক্ষা লাভ করেন। তিনি সংস্কার আন্দোলনের নেতা আবদাল ওহাবের সংস্পর্শে আসেন। ১৮১৮ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি ওহাবী আন্দোলনের সূচনা করেন যা বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৯]

মূলত আরবদের সংগে যোগাযোগের এ ধারা বৃটিশ আমলেও অব্যাহত থাকে । এ আমলে ভারতবর্ষ তথা বাংলায় ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। আজকের বাংলাদেশ 'পূর্ববঙ্গ' নামে পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। অবিভক্ত ভারতের ১ কোটি মুসলমানের মধ্যে ৬৫ লাখ মুসলমান পাকিস্তানে চলে আসে।[১০] আরবদের দৃষ্টিতে পাকিস্তান মুসলমানদের রক্ষাকারী হিসাবে পরিগনিত হয়। পাকিস্তান সৃষ্টি উপলক্ষে১৯৪৭ সালে সৌদি আরবে বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সৌদি আরবই আরব বিশ্বের প্রথম রাষ্ট্র যে প্রথম পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেন এবং করাচির সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন।[১১] আরব বিশ্বের সংগে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রথম সংযোগ ঘটে পাকিস্তানের উদ্যোগে ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত আর্ন্তজাতিক ইসলামী অর্থনৈতিক সম্মেলনের মাধ্যমে। মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো এতে অংশ নেয় এবং তারা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের পাকিস্তানের সুপারিশগুলোর প্রশংসা করেন[১২]। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধে বেশির ভাগ মুসলিম রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও সৌদি আরব পাকিস্তানকে অকুণ্ঠ সমর্থন দেয়। এর পর থেকেই পাকিস্তানও আরব বিশ্বের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে থাকে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে পাকিস্তান আরব স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে সরাসরি আরবদের পক্ষ নেয়। এই যুদ্ধের পর পর মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশ যেমন- সৌদি আরব, জর্ডান, লিবিয়া, ইরানের সামরিক বাহিনীকে ঢেলে সাজানো ও প্রশিক্ষণের দায়িত্ব পায় পাকিস্তান। এ সময়েই বাদশাহ ফয়সাল আরব বিশ্বের নতুন নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত উদ্যোগে গঠিত হয় ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ও আই সি)। ১৯৬৯ সালে রাবাতে অনুষ্ঠিত এই সংস্থার প্রথম সম্মেলনে আরব বিশ্বের সদস্য না হয়েও পাকিস্তান প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে এবং সংস্থার আমন্ত্রণ পেয়েও পাকিস্তানের আপত্তির কারণে ভারতের প্রতিনিধিকে সম্মেলনের শেষে দিন বহিস্কার করা হয়। এর পর থেকে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত পাকিস্তান সংস্থার অন্যতম নীতি নির্ধারকে পরিণত হয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সৌদি আরব

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সৌদি আরবের দৃষ্টিতে পাকিস্তানের দু'অংশের ইসলামী সংহতি বিনষ্টের এক অপপ্রয়াস হিসাবে প্রতীয়মান হয়েছে। পাকিস্তান ও তার মিত্রদের প্রচারে বিভ্রান্ত সৌদি আরব তাই অবস্থা মূল্যায়ন ও পর্যবেক্ষণ না করেই মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। সৌদি দৈনিক পত্রিকা 'আল মদিনা' ও 'আল বেলাদ' মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস হয়ে ওঠে পাকিস্তানের মুখপাত্র। এপ্রিলের প্রথম দিকে এ পত্রিকা দু'টো পাকিস্তানের আইন শৃংখলা পূণঃপ্রতিষ্ঠা এবং ঐক্য ও অখন্ডতা বজায় রাখার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ২৫ মার্চের সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের যৌক্তিকতা তুলে ধরে।[১৩] কারণ আল-মদিনার ভাষায়ঃ Mujib behaved like a gambling thoughtless person, who is thirsty for power, even though this may be at the expense of his Nation and People.[১৪]

২৮ এপ্রিল সৌদি উপ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ ওমর আল সাকাফের দেয়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক ঘোষণায় পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সৌদি সরকারের পূর্ণ ও অকুন্ঠ সমর্থনের কথা ব্যক্ত করা হয়।[১৫] এই বিবৃতি অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সকল পত্রিকায় ফলাও করে প্রচার করা হয় যা বাংলাদেশের স্বাধীনতাপ্রিয় মুসলমানদের মধ্যে স্বভাবই সৌদি আরবের তৎকালীন ক্ষমতাসীনদের প্রতি ক্ষোভের সঞ্চার করে। এপ্রিল মাসের মধ্যেই সৌদি আরব পাকিস্তানকে সমর্থনের পাশাপাশি নগদ ১০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দেয় বলে ভারতীয় সরকারি সূত্রে উল্লেখ করা হয়।[১৬] পাকিস্তান সরকার এ তথ্যটি স্বীকার না করলেও ১১ মে করাচিতে প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের এক তথ্য বিবরণীতে জানা যায় পাকিস্তান সরকার পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলো থেকে ১০০-১২০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য লাভের চেষ্টা করেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে অপর পাকিস্তান সূত্রের সংবাদে বলা হয় সৌদি আরব, কুয়েতসহ উপসাগরীয় দেশগুলো ৫০-৬০ মিলিয়ন ডলার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।[১৭] এই তথ্যগুলো ভারতীয় সূত্রের তথ্যের সমর্থন দেয়।

সেপ্টেম্বর মাসে সৌদি সরকার বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর 'বীরত্বপূর্ণ' কাজের প্রশংসা করে বিবৃতি দেয়। ৭ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানে নিযুক্ত সৌদি কন্সাল পাকিস্তানি বাহিনীর 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে' বীরত্বের প্রশংসা করেন এবং আশা পোষণ করেন 'পাকিস্তান সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষা' জন্য অতীতের বীরত্বপূর্ণ ঐতিহ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে।[১৮] অক্টোবরে সৌদি

আরব আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে পাকিস্তানকে ৭৫টি জঙ্গীবোমারু বিমান সরবরাহ করে।[১৯] মুজিবনগর থেকে প্রকাশিত 'জয় বাংলা' পত্রিকায় ২৯ অক্টোবর এক রিপোর্টে বলা হয় বিমানগুলো ইতোমধ্যে অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বিমান বন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। মার্কিন কংগ্রেস পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরনে নিষেধাজ্ঞা জারি করলে নিক্সন প্রশাসন সৌদি আরব, ইরান ও জর্ডানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে অস্ত্র দেয়ার যে উদ্যোগ নেয় সৌদি বিমানগুলো ছিল সেই কর্মসূচিরই অংশ।[২০]

নভেম্বরে বাংলাদেশের রণাঙ্গনে পাকিস্তানি বাহিনী বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও সৌদি সরকার পাকিস্তানকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখে। নভেম্বরে ঈদুল ফেতর উপলক্ষে মক্কা ও মদিনার মসজিদে ঈদের নামাজের মোনাজাতে পাকিস্তানের আঞ্চলিক নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়।[২১] ৩ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে সৌদি সরকার আরো প্রকাশ্যে পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। ৬ ডিসেম্বর সৌদি মন্ত্রী সভার এক বৈঠকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'ভারতীয় আগ্রাসনের' নিন্দা করে যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘের প্রতি উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানানো হয়।[২২] ৯ ডিসেম্বর পাকিস্তানে সৌদি দূতাবাসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ভারতীয় হামলাকে আর্ন্তজাতিক সনদ ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এ ছাড়া জাতিসংঘে নিযুক্ত সৌদি প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের উপর ভারতীয় হামলার নিন্দা করেন।[২৩]

শুধু সৌদি গণমাধ্যম ও সরকারই নয়, সৌদি আরবের অন্যতম বেসরকারী প্রতিষ্ঠান রাবেতা আল আলম আল ইসলাম ১৬ ডিসেম্বর এক ঘোষণায় সকল মুসলিম রাষ্ট্রকে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ও অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের সাহায্যে অস্ত্র ও যোদ্ধা পাঠানোর আহ্বান জানায়।[২৪] যদিও ঐদিন পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পন করায় মুসলিম রাষ্ট্রগুলো রাবেতার ডাকে সাড়া দিয়ে জেহাদ ঘোষণার সুযোগ পায় নি।

এভাবে মুক্তিযুদ্ধের ন'মাস সৌদি আরব বাঙালি জাতির বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করে এবং অখন্ড পাকিস্তানের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে দেরি করার কারণ

মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্ব ছিল পাকিস্তানপন্থী। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর সৌদি আরবসহ আরব বিশ্ব সহজে নিজেদের নৈতিক

পরাজয় ও বাংলাদেশকে মেনে নিতে পারে নি। ইরাক, মিসর, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এসময় বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ সদস্যের পাকিস্তান প্রীতির জন্য এসব দেশ বাংলাদেশের পক্ষে কোন বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করে নি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রতি মুসলিম বিশ্বের এই বৈরি মনোভাবের কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করা যায়। প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ার হোসেন এ প্রসঙ্গে তিনটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথমতঃ আপাতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের প্রতি ইসরাইলের সমর্থন ও স্বীকৃতি তাদেরকে ক্ষুব্ধ করেছিল। এ সমর্থন ও স্বীকৃতি বাংলাদেশ প্রত্যাখ্যান করলেও তাদের মনে একটা ধারনা, গড়ে উঠেছিল যে, অদুর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ইসলাম বিরোধী রাষ্ট্র হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিতীয়তঃ ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে তারা ইসলামী সংহতির 'একনিষ্ঠ সেবক' পাকিস্তানের বিরাগভাজন হতে চায়নি। তৃতীয়তঃ তারা ভেবেছিল, ভারতের তাবেদার একটি দুর্বল রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে কোন কূটনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার হবে না।[২৫] উল্লেখিত কারণ ছাড়াও আরো কয়েকটি কারণ বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

চতুর্থত, বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে চারটি মূল নীতি ঘোষণা করে তার মধ্যে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্যতম। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, পাকিস্তান ও মুসলিম বিশ্বের মতে এর ফলে বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট প্রভাব প্রসার ঘটবে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দক্ষিণ এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করবে। পঞ্চমত, বাংলাদেশ সরকার জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামীসহ ধর্মভিত্তিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ করে। স্বাধীনতার পর এসব দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারা সৌদি আরব ও পাকিস্তানে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালায় যার দ্বারা মুসলিম বিশ্ব প্রভাবিত হয়। ষষ্ঠত, এক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান একটি বাধা হয়ে দাড়ায়। প্রেসিডেন্ট ভুট্টো ও তাঁর সভাসদবর্গের বড় অংশ ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন । তাঁরা ১৯৭৪ সালে স্বীকৃতি দেয়ার আগে পর্যন্ত বাংলাদেশকে 'মুসলিম বাংলা,' 'ঢাকা কর্তৃপক্ষ', 'পূর্ব পাকিস্তান' হিসেবে চিহ্নিত করে। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের অন্তবর্তীকালীন সংবিধান ও ১৯৭৩ সালের সংবিধানে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের একটি প্রদেশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে পাকিস্তানের দূতাবাস থাকায় পাকিস্তানের বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানো সহজ হয়। ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে ৮টি এবং মে মাসে ভুট্টো স্বয়ং মুসলিম বিশ্বের ১৪টি দেশ সফর করেন [২৬] এবং বেশীর ভাগ দেশের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করেন ১৯৭২

সালের ২৮ জুন আসন্ন পাক-ভারত বৈঠকের আগে কোন মুসলিম দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে না। ভুট্টোর এই সকল তৎপরতার উদ্দেশ্য ছিল শেখ মুজিবের সংগে শীর্ষ বৈঠক বা মধ্যস্থতার মাধ্যমে পাকিস্তানের পুনঃএকত্রীকরণ। অবশ্য এসব দেশ তাদের কথা রেখেছিল। ইরাক ছাড়া বাকী দেশগুলো এই সময়ে স্বীকৃতি দেয় নি।

সপ্তমত, ১৯৭১ সালে গড়ে ওঠা চীন-মার্কিন আতাঁত এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংগে এ দুটো দেশের ক্রমবর্ধমানর নৈকট্যতা বাংলাদেশের সংগে সম্পর্ক স্থাপনে বাঁধা হয়ে দেখা দেয়। মুক্তিযুদ্ধে ও স্বাধীনতার পর চীন মার্কিন চক্রের সাথে সাথে আরব বিশ্বও বাংলাদেশ বিরোধী অবস্থান নেয়। গণচীন বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভে বিরোধিতা করে ভেটো দেয়। শেখ মুজিবের জীবদ্দশায় চীন ও সৌদি আরব স্বীকৃতি না দেয়া পাকিস্তানের সংগে এ দু'টো দেশের আঁতাতের ফলশ্রুতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

অষ্টমত, পাকিস্তান, ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা এবং দক্ষিণ এশিয়াকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত এলাকার দাবি জানায়। ভারত, ভারত মহাসাগরকে শান্তির এলাকা ঘোষণার দাবিকে সমর্থন করলেও দক্ষিণ এশিয়াকে পারমাণবিক মুক্ত এলাকা ঘোষণার দাবিকে সমর্থন করে নি। বরং ১৯৭৪ সালে ভারত পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। আরব বিশ্ব পাকিস্তানের নীতিকে সমর্থন করে।[২৭] কিন্তু বাংলাদেশ, ভারত ঘোষিত নীতিকে সমর্থন জানায়। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিকে ভারত প্রভাবিত বলে চিহ্নিত করে।

বাংলাদেশ- সৌদি সম্পর্কের নির্ধারকসমূহ

নির্ধারক সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়- সাধারণ ও বিশেষ নির্ধারক। সাধারণ নির্ধারক যার মাধ্যমে দু'পক্ষই সম্পর্কে আগ্রহী এবং কি কি লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সংগে সম্পর্কে আগ্রহী এবং কি কি কারণে মুসলিম বিশ্ব বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কে আগ্রহী সেগুলোকেই বিশেষ নির্ধারক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম বিরোধী শক্তির হুমকির মুখে রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। অন্য দিকে মুসলিম বিশ্বের নিজের জাতীয় স্বার্থে বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশের সহযোগিতা দরকার। কারণ খুব কম মুসলিম রাষ্ট্রেই প্রতিষ্ঠিত সরকার বৈধ ক্ষমতার অধিকারী । কাজেই তারা ইসলামী সংহতির নামে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ায় মুসলিম বিশ্বের প্রভাব বৃদ্ধি, দক্ষিণ এশিয়ার

সবচেয়ে বড় রাষ্ট্র ভারতের একাধিপত্য হ্রাস এবং আঞ্চলিক শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের সহযোগিতা প্রয়োজন। সহযোগিতা ও সমর্থন প্রয়োজন প্যালেস্টাইনসহ আরব সমস্যার ক্ষেত্রেও । ১৯৭৩ সাল থেকে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ ও প্যালেস্টাইন ইস্যুতে বাংলাদেশ আরব বিশ্বের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ পায়।

এছাড়া পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে নৈকট্য স্থাপনের দ্বারা উপমহাদেশকে হিন্দু ভারতের প্রভাব মুক্ত রাখতে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্ব সচেষ্ট হয়। কিন্তু মুজিব আমলে বাংলাদেশের সংগে ভারতের সুসম্পর্ক এবং সৌদি আরবের অত্যাধিক পাকিস্তান প্রীতির কারণে পাক-সৌদি আরবের ভারতবিরোধী মোর্চা বাংলাদেশে তেমন প্রভাব ফেলে নি। বাংলাদেশ সৌদি আরব সম্পর্কের নির্ধারকের ক্ষেত্রে দেখা যায় পাকিস্তান তাই একটি ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করেছে এবং বাংলাদেশ পাকিস্তান সম্পর্ক বাংলাদেশ-সৌদি সম্পর্কের উপরও প্রভাব ফেলেছে।

যদিও বাংলাদেশের নিজেরও ভারতকেন্দ্রিক নিরাপত্তা সমস্যা আছে। ১৯৭৩ সালের মধ্যেই সীমান্ত, ফারাক্কা নদীর পানি বন্টনসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের সংগে বাংলাদেশের সম্পর্কের সংকট দেখা দিতে থাকে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ ওআইসিতে যোগদান ও সদস্যপদ লাভ স্পষ্টতই বাংলাদেশের রুশ-ভারত অক্ষ শক্তি থেকে বেরিয়ে এসে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের ইংগিত দেয়। ফলে ভারতকেন্দ্রিক নিরাপত্তার সমস্যায় মুসলিম রাষ্ট্রের সম্ভাব্য সাহায্য ও সহযোগিতা বাংলাদেশের কাছে অর্থবহ হয়ে ওঠে।[২৮] বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে নির্ধারকগুলো মূল্যায়ণ করলে দেখা যায়।

প্রথমত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দেশের পূর্নগঠন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফোরাম, জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পূর্বশর্ত হচ্ছে স্বীকৃতি। পাকিস্তানের প্রচারণায় বিভ্রান্ত মুসলিম বিশ্বের স্বীকৃতি লাভ ছিল একটি জটিল বিষয়। ১৯৭২ সালে প্রায় ১০০টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এর মধ্যে আরব বিশ্বের দেশ হচ্ছে দুটো (পরিশিষ্ট-দ্রষ্টব্য) । অবশ্য ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভে মুসলিম বিশ্বের যথেষ্ট ইতিবাচক ভূমিকা থেকে স্বীকৃতির গুরুত্ব অনুধাবন হয়। বৈরীভাবাপন্ন আরব বিশ্বই ১৯৭৪ সালে এসে বাংলাদেশের প্রতি মনোভাব পরিবর্তন করে। এ বছর আরব লীগ একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে বাংলাদেশকে সদস্য পদ দানের জোরালো দাবি জানান।[২৯]

দ্বিতীয়ত, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুর্নগঠনের জন্য বাংলাদেশের প্রচুর অর্থের প্রায়োজন ছিল। স্বাধীনতার পর পর ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ কমিউনিষ্ট ব্লক থেকে প্রাপ্ত সাহায্য ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। বাংলাদেশ সরকার তাই অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের অভিপ্রায়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যসহ (পৃথিবীর তেরটি তেল উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে নয়টিই হচ্ছে আরব রাষ্ট্র) বিভিন্ন দেশে সাহায্যের আহ্বান করে। তেল সম্পদের বিনিয়োগ প্রাপ্ত পেট্রোডলার বিভিন্ন দরিদ্র মুসলিম রাষ্ট্রের জন্য ঋণ বা সাহায্যের উৎস। সৌদি আরবের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৭০ এর দশকের শেষার্ধে এসে দেশটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর দ্বিতীয় দাতা দেশে উপনীত হয়। ১৯৭৪ সালের আগষ্টে প্রতিষ্ঠিত হয় সৌদি উন্নয়ন তহবিল (Saudi Fund for Development)। মূলত দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্যের জন্য গঠিত হয় এ তহবিল। ১৯৭৫ সালের অক্টোবরে এ তহবিলের ফান্ড ২.৫ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয় যা সৌদি জিডিপির ২৩.৫%।[৩০] এসময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরই সৌদি আরব ছিল বৃহত্তম দাতা দেশ।[৩১] ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ যখন প্রবল অর্থ সংকটে পতিত হয় এবং পশ্চিমা উৎসগুলো বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করে তখন বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সাহায্যের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালে মিসর, ইরাক ও দক্ষিণ ইয়েমেনের সরকার প্রধানদের কাছে প্রেরিত একটি বাণীতে শেখ মুজিব বলেনঃ এদেশগুলোর বিষয়টি অজানা নয় যে, পাকিস্তানি দখলাদার সেনাবাহিনীর ধ্বংস করে যাওয়া অর্থনীতিকে নতুন করে গড়ে তোলার কাজে বাংলাদেশ নিয়োজিত এবং এতে তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।[৩২] বাংলাদেশ অবজারতার ১৯৭২ সালের ২৯ আগষ্ট এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে এ বিষয়টির গুরুত্ব স্পষ্ট করে তুলে ধরে - আমরা এ বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারি যে, এ সংকটময় মুহূর্তে আমরা সারা বিশ্ব, বিশেষ করে আরবদের সহানুভুতি ও সহযোগিতা বন্ধুত্ব চাই এবং ন্যায়সংগতভাবে দাবি করতে পারি।

তৃতীয়ত, আরব-ইসরাইল যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ওপেক ১৯৭৩ সাল থেকে তেলের মূল্য বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সাল থেকে তেলের মূল্য ব্যারেল প্রতি ৩.২৯ ডলার থেকে এক লাফে ১১.৫৮ ডলারে উন্নীত হয় (সারণি-১)। অপরিশোধিত তেলের জন্য বাংলাদেশ সম্পূর্ণরুপে মধ্যপ্রাচ্যের উপর নির্ভরশীল। ১৯৭৪-৭৫ এর সংকটময় দিনগুলোতে বাংলাদেশ ইরান ও আবুধাবীর কাছে হ্রাসকৃত মূল্যে তেল সরবরাহের জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু বাংলাদেশ কোন সহযোগিতা পায় নি। বিশ্বের বাজারে প্রচলিত মূল্যে তেল ক্রয়ের ফলে ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরে এখাতে বাংলাদেশের ২০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। [৩৩] এর ফলে

বাংলাদেশকে প্রতিবছর তার অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যয় করতে হয়েছে।[৩৪] সৌদি আরব বিশ্বের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর অন্তর্ভুক্ত। তাই সৌদি আরবের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন দ্বারা স্বল্প মূল্যে তেল পেতে চেয়েছে।

সারণি: ১

বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য ১৯৭১-৭৫

বৎসর	মূল্য (ব্যারেল প্রতি মার্কিন ডলার)
১৯৭১	২.২০
১৯৭২	২.৪৭
১৯৭৩	৩.২৯
১৯৭৪	১১.৫৮
১৯৭৫	১১.৫৩

উৎস ঃ Juhahyr Mikdashi, 'Oil Price and OPEC, Surpluses : Some Reflections', *International Affairs* (London), Summer, 1981. উদ্বৃত সফিউদ্দীন জোয়ারদার, *আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য* (ঢাকাঃ ১৯৮৭) পৃঃ ৫৮৪-৮৫।

চতুর্থত, বাংলাদেশের শতকরা ৮৭ ভাগ মানুষ মুসলমান। হজ্ব পালনের জন্য সৌদি গমণ সামর্থবান মুসলমানদের জন্য ফরজ। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকিস্তানের পাসপোর্টে ২৭০১ জন বাঙালি হজ্বে যান এবং বাংলাদেশ সরকারের ব্যবস্থাধীনে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৭২ সাল থেকে বাঙালি মুসলমানদের হজ্বে গমণ নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশ সরকার সৌদি আরবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে থাকে।

পঞ্চমত, সত্তরের দশক থেকেই আরব বিশ্বে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হয়। বিভিন্ন প্রকল্পে দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকসহ বিপুল সংখ্যক জনশক্তি আরব বিশ্ব আমদানি করে। জনসংখ্যার এই অংশকে মধ্যপ্রাচ্য পাঠিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন নিশ্চিত করতে চেয়েছে।

ষষ্ঠত, স্বাধীনতার পর পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দি, অবাঙালিদের পাকিস্তান প্রেরণ, বাঙালিদের দেশে ফিরিয়ে আনা, পাকিস্তানের স্বীকৃতি এবং পাকিস্তানের কাছে বাংলাদেশের পাওনা ইস্যুতে বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের সমর্থন কামনা করেছে।

বাংলাদেশ সৌদি সম্পর্কঃ ইস্যু সমূহ

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে যা পাকিস্তান ও তার মিত্র সৌদি আরব মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানের নব নিযুক্ত প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জুলফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭১ সালের ২০ ডিসেম্বর ক্ষমতা গ্রহণ উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেয়া বক্তৃতায় যে কোন মূল্যে পাকিস্তানের ঐক্য ও অখন্ডতা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন।[৩৫] ২২ ডিসেম্বর সৌদি বাদশাহ ফয়সাল ভূট্টোকে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে যে তারবার্তা পাঠান তাতে ' পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষার সংগ্রামে' সৌদি সমর্থনের আশ্বাস দেন।[৩৬] মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে এবং স্বাধীনতার পর পর যে সব স্বাধীনতা বিরোধী বিভিন্ন পথে পালিয়ে বাংলাদেশ ত্যাগ করে পাকিস্তান ও সৌদি আরব তাদের আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে।[৩৭] এ দু'টো দেশ বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণার কেন্দ্রে পরিনত হয়।

উল্লেখিত পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা পরবর্তীতে (১৯৭১-৭৫) সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ক্ষেত্রে কয়েকটি ইস্যু লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ ১৯৭১ সালে হজ্বে গমণকারী পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী বাঙালিদের স্বদেশ ফেরৎ প্রসঙ্গ, দ্বিতীয়তঃ ১৯৭২ সাল থেকে হজ্বে গমণকারী বাঙালিদের বিষয় সৌদি আরবের সঙ্গে আলোচনা, তৃতীয়তঃ সৌদি আরবের চাকুরি ও ব্যবসারত পাকিস্তানি পাসপোর্টধারী বাঙালিদের নিরাপত্তা প্রদানে সৌদি আরবের সংগে আলোচনা, চতুর্থতঃ সৌদি আরব কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান।

(ক) ১৯৭১ সালে হজ্বে গমণকারীদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১৯৭১ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ থেকে ২৭০১ জন বাঙালি পাকিস্তানের পাসপোর্ট সৌদি আরব গমণ করেন।[৩৮] অবরুদ্ধ বাংলাদেশ থেকে ঐ বছরই সবচেয়ে কম লোক হজ্বে যান। এসব হাজীদের মধ্যে পাকিস্তান সরকার পরিকল্পিতভাবে সরকারি খরচে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে কিছু লোক পাঠায়। বাংলাদেশ ও ভারত বিরোধী প্রচারণার উদ্দেশে তাদের পাঠানো হয়। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেলে বাংলাদেশ সরকার বাঙালি হাজীদের ফিরিয়ে আনার উদ্যেগে নেন। তারা পাকিস্তানের পাসপোর্টে সৌদি আরব যাওয়ায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যাপারে পাকিস্তান দূতাবাস তাদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারে না। পাকিস্তান চিরাচরিত কূটকৌশলের

আশ্রয় নিয়ে এসব হাজীদের জোরপূর্বক পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা চালায়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার সৌদি সরকারের সহযোগিতা কামনা করে। ১৯৭২ সালের ২৩ জানুয়ারি শেখ মুজিব বাদশাহ ফয়সালের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় বাঙালিদের হজ্ব পালন ও পরে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব সৌদি আরবের ভারতীয় দূতাবাস ও হজ্ব মিশনকে প্রদানের অনুমতি চান। তিনি বলেন ঃ

> ভারত সরকার সৌদি আরব থেকে ২৭০১ জনের মধ্যে ১৫০০ জনকে ফেরৎ আনার জন্য এস, এস, মোহাম্মদী নামে একটি জাহাজের ব্যবস্থা করেছে। জাহাজটি ২০ জানুয়ারী জেদ্দা পৌঁছাবে এবং ২৮ জানুয়ারী সৌদি আরববের সম্মতি সাপেক্ষে তাদের নিয়ে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবে। ভারত সরকার এ ব্যাপারে আরো একটি জাহাজের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছে এবং যদি কোন জাহাজ পাওয়া না যায় তবে বাকী হাজীদের আসার জন্য এস, এস, মোহাম্মদী আবার ফিরে যাবে।[৩৯]

এই বার্তার ব্যাপারে সৌদি প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বলেন সৌদি আরব প্রধানমন্ত্রীর পত্রসহ কোন পত্রের জবাব দেয়নি।[৪০] অবশ্য এ বক্তব্যের কয়েকদিন পর ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে সৌদি আরব এস, এস, মোহাম্মদীকে বাঙালি হাজিদের আনার অনুমতি দেয়। পহেলা মার্চ ১৯৭২ সালে ১৪৯২ জন হাজী নিয়ে জাহাজটি চালনা বন্দরে পৌঁছে।[৪১] বাকী হাজীরাও একই জাহাজে ফিরে আসেন।

খ) বাঙালি হাজীদের হজ্জ্বব্রত পালন

১৯৭১ সালে হজ্ব পালনকারী বাঙালিদের স্বদেশ প্রত্যার্বতনে সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের পর ১৯৭২ সালে হজ্বের মওসুম এগিয়ে আসে। বাংলাদেশ সরকার ধর্মপ্রাণ বাঙালি মুসলমানদের হজ্বে প্রেরণের জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখেন। ১৯৭২ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ ওমর আল সাকাফের কাছে প্রেরিত এক তারবার্তায় বিশেষ বিবেচনায় বাঙালিদের হজ্ব পালনের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সৌদি সরকারকে বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল মুসলিম দেশ যেমন- ইরাক, মিশর, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার মাধ্যমেও অনুরোধ জানানো হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সৌদি বাদশাহ ফয়সালকে দেয়া এক বার্তায়

পবিত্র হজ্বব্রত পালনে ইচ্ছুক বাঙালিদের আসন্ন হজ্ব মওসুমে সৌদি আরবে গমণের সুযোগ দানের অনুরোধ জানান। বার্তায় তিনি বলেনঃ ভিসা দেয়ার সুবিধার্থে সৌদি আরবের কোন কর্মকর্তা বাংলাদেশে পাঠাতে চাইলে বাংলাদেশ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করবে এবং তাঁকে সব ধরণের সুযোগ দেয়া হবে। বাদশার যদি কোন আপত্তি না থাকে আমরা সেখানে আমাদের হাজীদের দেখাশোনার জন্য অফিসারদের একটি দল পাঠাতে পারি।[৪২]

সৌদি আরব সরকার পাকিস্তানি প্ররোচনায় বাঙালি হাজীদের ব্যাপারে প্রথম দিকে নীরবতা পালন করে। সৌদি আরবে আশ্রয় গ্রহণকারী স্বাধীনতা বিরোধিতারাও হজ্বের প্রাক্কালে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারনা জোরদার করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যার নায়ক গোলাম আযম হজ্বের বহু আগে থেকেই সৌদি অবস্থান করে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারাভিযানে নেতৃত্ব দেন। এসব প্রচারণা সত্ত্বেও বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল মুসলিম দেশগুলোর প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ সফল হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ ১৯৭২ সালের ৬ অক্টোবর সাংবাদিকদের জানান সৌদি সরকার বাঙালিদের বাংলাদেশের পাসপোর্টে হজ্ব পালনের অনুমতি দিয়েছে।[৪৩]

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সবুজ পাসপোর্টধারী ৬৫৯৫ জন বাঙালি সৌদি আরব যান। এর মধ্যে ৫০০০ বাঙালি আমেরিকার ভাড়া করা বিমানে যান। সৌদি আরব স্বীকৃতি না দেয়ায় এবং বাংলাদেশ বিমানের সংগে সৌদি বিমান কর্তৃপক্ষের চুক্তি না থাকায় বাংলাদেশ বিমান সৌদি যেতে পারে নি। বাংলাদেশ সরকার আরব বিশ্বকে বাংলাদেশে ইসলাম চর্চা, বাংলাদেশের অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে মওলানা আব্দুর রশিদ তর্কবাগিশকে দলনেতা করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট একটি হজ্ব মিশন সৌদি আরবে পাঠায়। মিশনের প্রধান সমন্বয়কারী ছিলেন আব্দুর রব, মেডিকেল অফিসার ছিলেন এস, আই, চৌধুরী। সদস্য ছিলেন আবদুল মোমেন, আবদুল বাতেন, মওলানা আহারুজ্জামান, মুনির আহমেদ, শামসুল আবেদিন, সৈয়দ আলম খান প্রমুখ। এই মিশন ১৯৭২ সালের ২৮ নভেম্বর সৌদি আরব পৌঁছে এবং ১৯৭৩ সালের ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত অবস্থান করে। পাকিস্তানের প্রচারণায় বিভ্রান্ত মুসলিম বিশ্বের কাছে বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরতে এ মিশন গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বাংলাদেশে 'মসজিদ ভেঙ্গে মন্দির করা হচ্ছে','ইসলাম বিপন্ন' এধরনের শ্লোগানের বিপরীতে হজ্ব মিশনের সদস্যরা বিভিন্ন দেশের হজ্ব মিশন ও হাজীদের শিবিরে গিয়ে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি তুলে ধরেন। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা, বাংলাদেশে মুসলমানদের স্বাধীনভাবে ধর্ম চর্চার কথা তুলে ধরেন। মুসলিম বিশ্বের

অনেকে এমনকি পাকিস্তানি অনেক হাজী বাঙালি হজ্ব মিশনকে জানান বাংলাদেশের যুদ্ধকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁরা অবগত ছিলেন না। ইরাক ও আফগানিস্তানের হাজীরা বাংলাদেশের হাজীদের বিষয় বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। ১৯৭২ সালের হজ্ব মিশনের সাফল্য সম্পর্কে মিশনের অন্যতম সদস্য সৈয়দ আলম খান বলেনঃ

> এতদিন পাকিস্তানের প্ররোচনায় যারা বিভ্রান্ত ছিলেন বাংলাদেশের মিশন দুই মাস অবস্থান করে হাজীদের সাথে বাক্যালাপে সত্য ঘটনা বর্ণনা করলে তারা পাকিস্তানের মিথ্যা প্রচার উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই মিশনটি সৌদি বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে ব্যাপক আলাপ আলোচনা করেন। মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গে বৈঠক হয় এবং তিনি মিশনকে ভোজসভায় আপ্যায়িত করেন। এছাড়া সৌদি আরবে বসবাসরত আরবি ভাষাভাষী (প্রায় ২০,০০০) বাঙ্গালিদের মধ্যে বিভ্রান্তির অবসান ঘটায়।[৮৪]

হজ্ব প্রতিনিধি দলের নেতা মওলানা তর্কবাগিশ দেশে ফিরে এসে মিশনের সাফল্য সম্পর্কে বলেন আরব জনগণ বাংলাদেশের হাজীদের প্রতি সহানুভূতির মনোভাব দেখিয়েছেন এবং তাদের ভুল ধারণা ভাঙ্গতে শুরু করেছে।[৮৫] যদিও পাকিস্তান ফিরে পাকিস্তান হজ্ব মিশনের সদস্যরা যথারীতি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ঘটা করে সংবাদিক সম্মেলন করেন। পাকিস্তান আওয়ামী ওলামা পার্টির সভাপতি ও পাক হজ্ব মিশনের সদস্য মওলানা ইরশাদুল হক থানভি ১৯৭৩ সালের ৩০ জানুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে সৌদি হজ্ব বুলেটিনে 'বাঙালিদের পূর্ব পাকিস্তানি' হিসাবে পরিচিত করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন।[৮৬] ২৬ জানুয়ারি করাচিতে দেয়া সাংবাদিক সম্মেলনে পাকিস্তান হজ্ব মিশনের অপর ২ জন সদস্য মুফতি মাহমুদ ও মওলানা গাউস হজরভী বলেন বাঙালি হাজীরা এখনো অখন্ড পাকিস্তান কামনা করেন এবং মুসলিম বাংলাকে ভারতের আধিপত্যবাদ থেকে মুক্ত করতে আগ্রহী। এ দু'জন আরো বলেন, হজ্ব মিশন সদস্যরা খন্ডিত মুসলিম বাংলা সম্পর্কে তাদের আক্ষেপ ব্যক্ত করেছেন। তাঁরা পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ায় নিজেদের ভুলের কথা স্বীকার করে পাকিস্তানের পুনঃএকত্রীকরণে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।[৮৭] পাকিস্তান হজ্ব মিশনের তিনজন সদস্যের একই ধারার বিবৃতি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠেছে পাকিস্তানের জনগণকে বিভ্রান্ত ও সত্য গোপন করার জন্যই এই বিবৃতি। যুদ্ধবন্দি ইস্যু, পাকিস্তানের বিপর্যস্ত অর্থনীতি ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে পাকিস্তানি জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে ভূট্টো সরকারের কূটকৌশলের অংশ হিসেবে পিপিপি সরকারের অর্থানুকুলে হজ্ব মিশনে গমণকারীদের এসব ভাষ্য বাঙালি হজ্ব মিশন সদস্য সৈয়দ আলম খান ও তর্কবাগিশের পূর্বে দেয়া বক্তব্য থেকে মিথ্যা প্রমাণ হয়। বাংলাদেশের এই মিশনের সাফল্যের জন্যই পরবর্তী বছর হজ্ব পালনে বাঙালিদের কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়নি।

১৯৭৩ সালে বাঙালি হাজীদের হজব্রত পালনে কিছু নতুন সুবিধা পাওয়ার কারণ হচ্ছে ইতোমধ্যে ২৭টি ওআইসি এবং মুসলিম ও ওআইসিভুক্ত দেশ বাংলাদেশ স্বীকৃতি দেয় । বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধে অকুণ্ঠ সমর্থন দিয়ে আরব বিশ্বে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে। যুদ্ধের শুরুতেই বাঙালিরা ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে । আরবদের প্রতি শুভেচ্ছার নিদর্শন হিসাবে পাঠায় ২৮ সদস্যের একটি চিকিৎসক দল। এটা ছিল বিদেশ থেকে পাঠানো দ্বিতীয় বৃহত্তম চিকিৎসক দল। একই সাথে যুদ্ধে গুরু দায়িত্ব বহনকারী মিশরের জন্য পাঠায় ১ লক্ষ পাউন্ড চা। আরো পাঠিয়েছে ৫০০০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেচ্ছা যোদ্ধা বাহিনী, যাদের প্রায় সকলেই ছিল মুক্তিযোদ্ধা।[৪৮] অথচ তখনো বাংলাদেশ অনেক মুসলিম দেশের স্বীকৃতি পায়নি। ১৯৭৩ সালে প্রায় ৫০০০ বাঙালি হজ্ব করতে যান। বাংলাদেশ সরকার আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মোল্লা জালাল উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি হজ্ব প্রতিনিধিদল সৌদি আরব পাঠায়। তবে ঐ বছর একটি ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও সৌদি বিমান এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি অনাকাংখিত ঘটনা ঘটে। ১৮৮ জন হাজী নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের ৭০৭ বিমান ১ ডিসেম্বর জেদ্দা পৌঁছলে সৌদি বিমান কর্তৃপক্ষ তা অবতরণে বাধা দেয়। সৌদি আরবের সংগে বিমান চুক্তি না থাকায় অবশেষে জরিমানা দেওয়ার পর বিমানটিকে জেদ্দা বিমান বন্দরে অবতরন করতে দেয়া হয়।[৪৯]

১৯৭৪ সালেও বাংলাদেশের ৫০০০ ব্যালটি হাজী হজ্ব ব্রত পালনের জন্য সৌদি আরব গমন করেন। বাংলাদেশ সরকার এবার হাজী দানেশকে দলনেতা, মওলানা আবদুল আউয়ালকে উপ-দলনেতা করে একটি হজ্ব মিশন সৌদি আরবে পাঠায়। এদলটি ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরে সৌদি আরব যায় এবং ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ দিকে দেশে ফিরে আসেন। বাংলাদেশে অব্যাহত গণতান্ত্রিক পরিবেশ, স্বাধীন ধর্মচর্চার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মসজিদের পোষ্টার সংগে নিয়ে যান। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল পুস্তিকার ৩০০ কপি ঢাকাস্থ মিশরীয় দূতাবাসের মাধ্যমে আরবিতে অনুবাদ করে সংগে নিয়ে যান। এগুলো হজ্ব উপলক্ষে আগত ৪০ টি দেশের হজ্ব প্রতিনিধিদের কাছে বিলি করা হয় । বাংলাদেশের এই হজ্ব প্রতিনিধি দলটি সৌদি সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, বাদশাহ ফয়সাল, মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মুফতি আবদুল্লাহ বায়াজের (বর্তমান গ্রান্ড মুফতি সৌদি আরব) সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। চ্যান্সেলর মুফতি আবদুল্লাহর সহযোগিতায় বাংলাদেশের হজ্ব মিশনকে সৌদি সরকারি সুবিধা দেয়া হয়। মুফতির সঙ্গে এক ঘন্টা বৈঠকে '৭১ সালে পাকিস্তানি

বাহিনী কর্তৃক মসজিদ ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞ তুলে ধরা হয় এবং তাঁকে কিছু ছবি দেখানো হয়। অবশ্য মুফতি অন্ধ থাকায় তাঁর সচিবের মাধ্যমে তিনি এগুলো জানতে পারেন। হজ্ব মিশনে তিনি আশ্বাস দেন স্বীকৃতির ব্যাপারে তিনি বাদশাহকে বিশেষভাবে অনুরোধ করবেন। এবারও মুসলিম বিশ্বকে বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা এবং পাকিস্তানের অপপ্রচার খন্ডন করা অনেকাংশে সম্ভব হয়। ১৯৭৪ সালে মিশনের সাফল্যে সম্পর্কে উপনেতা মওলানা আউয়াল বলেনঃ স্বীকৃতি না পেয়েও সেবার বিভিন্ন স্বীকৃতি প্রাপ্ত দেশের মতো আমাদের প্রতিনিধিদল সৌদি আরব সরকারের দেয়া সুযোগ সুবিধা লাভ করে। আমরাই প্রথম সৌদি বেতারে হজ্বের সময় বাংলায় অনুষ্ঠান প্রচার করি। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমতি নিয়ে আমরা মিনায় বাংলাদেশের পতাকা উড়ানোর সুযোগ পাই। সৌদি স্বীকৃতি ছাড়াই বাংলাদেশে এ সম্মান লাভ করে।[৫০]

অবশ্য পাকিস্তানের হজ্ব প্রতিনিধি দলের নেতা ধর্মমন্ত্রী কায়সার নিয়াজী দেশে ফিরে ১৯৭৫ সালের ২ জানুয়ারি সাংবাদিকদের জানান সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেয়ায় বাঙালি হাজীদের 'পূর্ব পাকিস্তানি' হিসেবে আখ্যা দিয়েছে।[৫১] বাংলাদেশের হজ্ব মিশনের উপনেতা মওলানা আবদুল আউয়াল পাকিস্তানি মন্ত্রীর এ বক্তব্যকে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, বরং সৌদি আরবে মওলানা নিয়াজির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি আমাদের তৎপরতার প্রেক্ষিতে অনুরোধ করে বলেছেন আপনারা স্বীকৃতি না পেয়েও মিনায় পতাকা উড়িয়েছেন, পাকিস্তান গিয়ে হয়তো দেখবো আমার মন্ত্রীত্ব নেই।[৫২]

১৯৭৪ সালের মধ্যে পাকিস্তানের স্বীকৃতি, ১৯৭২-৭৪ পর্যন্ত হজ্ব মিশনের সাফল্যজনক প্রচারণা, মুসলিম বিশ্বে প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী ও বিশেষ দূতদের ব্যাপক সফরের ফলে বাংলাদেশ সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বে নতুন ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়। ১৯৭৪ সালের হজ্ব মিশনের সঙ্গে সফল আলোচনা এবং ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক সৌদি স্বীকৃতির বিষয় অনেকটা চূড়ান্ত হয়।

গ) সৌদি আরবে অবস্থানরত বাঙালি প্রসঙ্গ

স্বাধীনতাত্তোর হাজীদের দেশে ফিরিয়ে আনা ছাড়াও সৌদি আরবে অবস্থানরত বাঙালি চাকুরিজীবী ও ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে বাংলাদেশ সরকারকে উদ্যোগ নিতে হয়। আরব বিশ্বে তখন প্রায় ২০,০০০ বাঙালি কর্মরত ছিলেন।[৫৩] তাঁরা ছিলেন

চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সামরিক বাহিনীর সদস্য ও দক্ষ শ্রমিক। শুধু সৌদি আরবেই প্রায় ৬০ জন বাঙালি চিকিৎসক কর্মরত ছিলেন। পাকিস্তানি পাসপোর্টে সৌদি আরবে অবস্থান করায় এসব বাঙালিদের স্বাধীনতার পর নাগরিকত্ব সমস্যা দেখা দেয়। দক্ষ এই জনশক্তিকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য পাকিস্তান সৌদি আরবের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এর দুটো কারণ ছিল- প্রথমত, এসব বাঙালি চাকুরে ও ব্যবসায়িরা প্রচুর পেট্রোলের আয় করতেন। দ্বিতীয়ত, স্বাধীন বাংলাদেশকে বিব্রত করা এবং এসব বাঙালিদের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানো। স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশ সরকার বাঙালিদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কিংবা স্ব স্ব কর্মস্থলে বাঙালি পরিচয়ে অবস্থানের অনুমোতির জন্য সৌদি আরবসহ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে অনুরোধ করেন। বাঙালিদের উপর মানসিক চাপ, নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন দেশের কর্মজীবী বাঙালিরা রাজনৈতিক আশ্রয়ও প্রার্থনা করেন। বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সৌদি আরব পাকিস্তানের চাপে সকল বাঙালিদের পাকিস্তান পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের ফলে অনেক বাঙালি কর্মস্থল থেকে পালিয়ে যান এবং সৌদি আরবে কর্মরত প্রায় ৬০ জন ডাক্তারের কেউ কেউ আত্মগোপনে বাধ্য হন। অবশ্য ১৯৭২ সালের ২ মে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদ সাংবাদিকদের জানান আরব বিশ্ব কর্মরত বিশ হাজার বাঙালিদের গৃহে প্রত্যাবর্তন কিংবা স্বস্ব কর্মস্থলে থাকার সুযোগ দিতে রাজি হয়েছে।[৫৪] অবশ্য সৌদি আরব তার পূর্ববর্তী সিদ্ধান্তে কার্যত অটল থাকে। কিন্তু বাস্তব অবস্থার কারণে পাকিস্তান পাঠানোর প্রক্রিয়া থেকে দূরে থাকে। দীর্ঘ দু'বছর কূটনৈতিক যোগাযোগের পর সৌদি আরব অবস্থানকারী বাঙালিদের প্রতি সৌদি সরকার তার দৃষ্টিভংগি পরিবর্তন করে। ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সৌদি আরবে বাংলাদেশের পাসপোর্টকে বৈধ ঘোষণা করেন। কায়রোস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে তাদের বাংলাদেশের পাসপোর্ট দেয়া হয়। সৌদি সরকার এসব বাঙালিদের চাকরি, ব্যবসায় অনুমতি দেন।[৫৫] বাংলাদেশের কায়রোস্থ রাষ্ট্রদূত আতাউর রহমান মাসে ২/৩ বার সৌদি আরব গিয়ে বাঙালিদের খোঁজখবর নিতেন। এই প্রথম বারের মতো বাংলাদেশের কোন সরকারী প্রতিনিধি সৌদি মাটিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি কার্যক্রম শুরু করার সুযোগ পান। এর থেকে বোঝা যায় সৌদি কূটনৈতিক মহল বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভংগির আমূল পরিবর্তন করতে যাচ্ছেন। এ সময় থেকে স্বীকৃতির বিষয়টি সৌদি আরবেও ব্যাপক আলোচিত হতে থাকে।

ঘ) সৌদি আরব কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রতিদিন স্বীকৃতি দিতে থাকে। এমনকি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৭২ সালেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। শুধু ১৯৭২ সালেই প্রায় ১০০টি রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো স্বীকৃতির বদলে ভুট্টোর প্রদর্শিত পথে 'পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতা' রক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়। সৌদি বাদশাহ ফয়সলের ব্যক্তিগত উদোগে এ মিশন চলতে থাকে। ১৯৭২ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি- ২ মার্চ জেদ্দায় অনুষ্ঠিত ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে সদস্যদের অধিকাংশ পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখন্ডতার উপর জোর দেন । ২৯ ফেব্রুয়ারি সম্মেলন উদ্বোধনকালে দেয়া সৌদি বাদশাহ ফয়সলের বক্তব্য থেকেও এ উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি বলেনঃ The enemies of Islam were responsible for the crisis in Pakistan, who had exploited the difference between its Eastern and Western wings for their own interest."[৫৬]

জেদ্দা সম্মেলনের প্রধান কর্মসূচি ছিল পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করে পুনরায় বাংলাদেশকে পাকিস্তানের সঙ্গে একত্রিত করা। এক্ষেত্রে মুজিব- ভুট্টো শীর্ষ বৈঠকের আয়োজন করার উপর জোর দেয়া হয়। সম্মেলন শেষে স্বাক্ষরিত যুক্ত ঘোষনায় আলজেরিয়া,ইরান, মালয়েশিয়া, মরক্কো, সোমালিয়া, তিউনিশিয়ার সমন্বেয়ে গঠিত একটি ৬ সদস্য বিশিষ্ট মিশন ইসলামাবাদ ও ঢাকায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ মিশন দু'দেশের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রচেষ্টা নিবে এবং পারস্পরিক মতদ্বৈততা কমিয়ে আনতে সহযোগিতা করবে।[৫৭] সম্মেলনের তিন দিনের কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য যুক্ত ইশতেহার থেকে পরিস্কার হয়ে যায়। বাংলাদেশ সরকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৯৭২ সালের ১৬ মার্চ স্পষ্টতই জানিয়ে দেয় এ দেশগুলোর মধ্যে যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি তাদের সংগে বাংলাদেশ কোন আলোচনায় বসতে রাজি নয়, এমনকি স্বীকৃতি দেয়নি এমন কোন দেশের প্রতিনিধিকে বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে না।[৫৮] উল্লেখ্য, মালয়েশিয়া ছাড়া বাকি ৫টি দেশ তখনো স্বীকৃতি দেয়নি।

বাংলাদেশের বলিষ্ঠ কূটনীতির কারণে সে যাত্রা ওআইসি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বিনাশের চক্রান্তের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ওআইসি জেদ্দা

সম্মেলন পাকিস্তানকে তোষণের নীতিতে এতোই অন্ধ ছিল যে, তাদের তিন দিনের কর্মসূচির কোথাও বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। পাকিস্তানের মতো তারাও বাংলাদেশকে 'ঢাকা কর্তৃপক্ষ' কিংবা 'মুসলিম বাংলা' হিসাবে উল্লেখ করেছে। মুসলিম বিশ্বের এই নীতি বাংলাদেশের জন্য ছিল রীতিমতো বিস্ময়কর। কারণ মাত্র এক মাস আগেই আফ্রো- এশিয় সংহতি সংস্থার (AAPSO) সম্মেলনে সমবেত আরব রাষ্ট্র সমূহের সংখ্যাগরিষ্ঠের সদস্যের সমর্থন নিয়ে বাংলাদেশ সংস্থার সদস্য হয়। মাত্র এক মাস ব্যবধানে মুসলিম বিশ্বের এ মনোভাব পরিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভুট্টোর মুসলিম বিশ্বের ৮টি দেশ সফর। এ সব দেশ সফরকালে ভুট্টো অনুরোধ করেন বাংলাদেশ ও পাকিস্তান ঐক্য প্রক্রিয়ার স্বার্থে এসব দেশগুলো যাতে হলে সিমলায় অনুষ্ঠিতব্য পাক-ভারত বৈঠকের আগে স্বীকৃতি না দেয়।

সৌদি আরব এভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিয়ে বরং পাকিস্তানের একত্রীকরণ ধারণাটিকে চাঙ্গা করে তুলেছে। জেদ্দা সম্মেলনে যোগদানকারী পাকিস্তান মন্ত্রী গাউস বক্স রায়সানী সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৈয়দ ওমর আল সাকাফের উদ্ধৃত দিয়ে সাংবাদিকদের জানান পাকিস্তান স্বীকৃতি না দেয়া পর্যন্ত সৌদি আরব বাংলাদেশকে কখনই স্বীকৃতি দিবেনা।[৫৯]

অথচ স্বাধীনতার পর সৌদি স্বীকৃতি বিষয়টিকে বাংলাদেশ সরকার অত্যাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কারণ এর সংগে সম্পর্কিত ছিল অর্থনৈতিক দিক, পাকিস্তানের সংগে সম্পর্ক এবং বাঙালিদের হজ্ব পালন প্রসঙ্গ। বিভিন্ন সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও মন্ত্রীদের উদ্যোগ ও তারবার্তা প্রেরণ, হজ্ব মিশন, দূত মাধ্যমে সৌদি আরবের স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করা হয়। কায়রোতে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আতাউর রহমান, বাংলাদেশের বিশেষ দূত আবু সাঈদ চৌধুরী, বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ডঃ নুরুল ইসলাম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী সামাদ আজাদ, ডঃ কামাল হোসেন, বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক, অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সময় জেদ্দা সফর করে সৌদি সরকারের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয় আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরব না গেলেও ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে আলজির্য়াসে জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের এক পর্যায়ে মুজিব-ফয়সল একান্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে বাদশাহ ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন। বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব ফখরুদ্দিন আহমদ এ সম্পর্কে বলেনঃ

> বাদশার একজন উপদেষ্টা যিনি কট্টর পাকিস্তানপন্থি ছিলেন তিনি বাদশাহকে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন সম্পর্ক ভ্রান্ত ধারনা দেন। তিনি

> বাদশাহকে বুঝাতে সক্ষম হন ধর্মনিরপেক্ষতার আবরণে বাংলাদেশ প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র। তুরস্ক ও ইন্দোনেশিয়া ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করলেও যে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং সৌদি আরবের এ দু'টো দেশের সঙ্গে কোন সমস্যা নেই তা বাদশাহ উপলব্ধি করেননি।[৬০]

আলজিয়ার্স সম্মেলনে যোগদানকারী বাংলাদেশ বেতারের তৎকালীন মহাপরিচালক এম আর আখতার মুকুল বলেন এ বৈঠকের আলোচ্যসুচিতে সৌদি বাদশাহ স্বীকৃতির জন্য দু'টি শর্ত উল্লেখ করেন। ১. বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' নামকরণ ২. ভারতে আটক পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি প্রদান। বঙ্গবন্ধু বাদশার দু'টি প্রস্তাব নাকচ করেন এবং বলেন বাংলাদেশে বিপুল সংখ্যক অমুসলিমও বসবাস করেন যারা স্বাধীনতার জন্য অসামান্য আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন। বাদশাহর দ্বিতীয় শর্ত সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু বলেন এবিষয়টি বাংলাদেশে ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয় বলে দু'দেশ তা মীমাংসা করবে যা সৌদি স্বীকৃতি পূর্বশর্ত হতে পারে না।[৬১] সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারী পররাষ্ট্র সচিব ও বেতারের ডিজি উভয়ে বলেন যে, বঙ্গবন্ধু বৈঠকের শুরুতেই মুক্তিযুদ্ধে সৌদি আরবের পাকিস্তানের পক্ষ সমর্থন করার বিষয়টি উত্থাপন করেন। তাছাড়া বাঙালি হাজীদের হজ্ব পালনে অনুমতি প্রদানে সৌদি বাদশাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বৈঠকের আলোচ্যসূচি থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে দু'নেতার এ বৈঠক সফল হয় নি। তবে দু'নেতা পরস্পর এক সংগে আলোচনায় বসেছিলেন এটিই বৈঠকের বড় সাফল্য। সে যাত্রা বৈঠক আকস্মিক সমাপ্ত হয়। এ দু'নেতার মধ্যে যদিও এরপর আর আনুষ্ঠানিক বৈঠক হয়নি। দু'জনই ১৯৭৫ সালে আততায়ির হাতে নিহত হন।

১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে এসে সৌদি-বাংলাদেশ শীতল সম্পর্কের খানিকটা অগ্রগতি হয়। এর কয়েকটি কারণও ছিলো। বাংলাদেশকে ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে মুসলিম দেশের অধিকাংশ দেশ স্বীকৃতি প্রদান করে। আলজিয়ার্স সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুর অংশগ্রহণ ও গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা মুসলিম বিশ্বের মধ্যেও বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন ধারনা সৃষ্টি হয়। সম্মেলনের এক পর্যায়ে সৌদি আরবের একজন সরকারি মুখপাত্র বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, মধ্যপ্রাচ্যে এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে আমাদের ধারনা অনেক পরিস্কার।[৬২] ১৯৭৩ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধে বাংলাদেশের আরব বিশ্বের প্রতি ভূমিকা গ্রহণ আরব বিশ্বের ইসরাইলের ব্যাপারে বাংলাদেশ সম্পর্কে এতো দিনের ধারনা পাল্টে দেয়। অন্যদিকে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি দান এবং প্রধানমন্ত্রীর লাহোর সম্মেলনে যোগদান বাংলাদেশের ও ওআইসির

সদস্যপদ লাভ বাংলাদেশ সম্পর্কে সৌদি আরবের সন্দেহের মেঘ কাটতে থাকে। লাহোর সম্মেলনে শেখ মুজিব ও বাদশাহর মধ্যে স্বীকৃতির বিষয় পৃথক একটি বৈঠকের সম্ভাবনার ব্যাপারে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মহল আশাবাদী হলেও শেষ পর্যন্ত স্বাগতিক দেশ পাকিস্তানের অসহযোগিতার কারণে তা হয়ে ওঠে নি। পাকিস্তান এ সময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীর মুক্তির দাবি জানিয়ে সম্মেলনে একটি আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব উপস্থাপনের উদ্দেশে একটি খসড়া জমা দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের ব্যাপক তৎপরতার ফলে অবশেষে সেটি চূড়ান্ত হয় নি এবং সম্মেলনের আলোচ্যসূচি হতে বাদ পড়ে। বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব বলেন, এ বিষয়টি নিয়ে তারা ব্যস্ত থাকায় বাদশাহর সঙ্গে বৈঠকের দিকটা চূড়ান্ত করতে পারেননি।[৬৩]

সৌদি বাদশাহর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর এরপর বৈঠক না হলেও বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়টি থেমে থাকেনি। বাংলাদেশ ১৯৭৩-৭৪ সালে তেল সংকটে পতিত হলে সৌদি আরবসহ তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোর কাছে সাহায্যের জন্য অনুরোধ জানায়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রাকৃতিক সম্পদ মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরী ১৯৭৪ সালের এপ্রিল সাংবাদিকদের জানান সৌদি আরব বাংলাদেশকে অপরিশোধিত তেল দিতে রাজী হয়েছে। শীঘ্রই এ ব্যাপারে দু'দেশের মধ্যে চুক্তি চূড়ান্ত করা হবে।[৬৪] যদিও এ সম্পর্কিত কোন চুক্তি শেখ মুজিবের শাসনামলে হয়েছে এ ধরনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাহায্যের প্রত্যাশায় অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ সফর করেন। ১৯৭৪ সালের আগস্টে তিনি জেদ্দাস্থ ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংকের সম্মেলনেও যোগ দেন। এই ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বাংলাদেশ উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের সর্বসম্মত নির্বাচন বাংলাদেশের একটি বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য । এছাড়া স্বীকৃতি না দিয়েও সৌদি আরব বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রীকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা প্রদান করে সৌদি বাংলাদেশ সম্পর্ক স্থাপনের নতুন ইঙ্গিত দেয়। এই সফরের সাফল্য হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ তৈল ও অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। দেশে ফিরে তিনি বলেন বাংলাদেশের প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় কুয়েত, ইরাক, আবুধাবি বাস্তব সাহায্য দিতে প্রস্তুত। সৌদি আরব বন্যা দূর্গতদের জন্য ১ কোটি ডলার সাহায্য ঘোষনা করে।[৬৫]

১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্য হয়। জাতিসংঘের সদস্য লাভের প্রাক্কালে বাংলাদেশের পত্র পত্রিকাগুলো আশাবাদ ব্যক্ত করে জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের পর পরই চীন ও সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে।[৬৬] যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন পত্রিকাও আভাস দেয় ২২/২৩ সেপ্টেম্বর এই সম্ভাবনা রয়েছে।[৬৭]

অবশ্য ১৯৭৪ সালের অক্টোবরের শেষ দিকে বাংলাদেশ সৌদি সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দ্যোগ কার্যত বাস্তবে প্রতিফলিত হতে থাকে। ৩১ অক্টোবর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন বঙ্গবন্ধুর একটি বার্তা নিয়ে সৌদি আরব সফর করেন। এ সফরে সৌদি বাদশাহ ছাড়াও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। এ বৈঠকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে এতো দিনের শর্তগুলোর ব্যাপারে সৌদি আরব বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। সৌদি সফর শেষে দেশে ফিরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরকে সফল বলে উল্লেখ করে বলেন বাদশাহ বাংলাদেশের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।[৬৮] বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যম এ সফরকে গুরুত্বসহ উপস্থাপিত করে। বাংলাদেশ টাইমস এ সফরকে সৌদি বাংলা সম্পর্ক স্থাপনের 'ভিত্তি প্রস্তর' বলে উল্লেখ করে।[৬৯] এসময় ডঃ কামাল হোসেন সাংবাদিকদের শীঘ্রই মুজিব ফয়সল বৈঠক অনুষ্ঠানের ইঙ্গিত দেন।[৭০]

সৌদি বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের সম্ভাবনা যখন উজ্জ্বল হচ্ছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বাংলাদেশের জনগণের একাংশের মধ্যে এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯৭৪ সালের ২২ নভেম্বর ঢাকায় গঠিত হয় 'বাংলাদেশ-সৌদি আরব মৈত্রী সমিতি'। কবি আবদুস সাত্তার এবং অধ্যাপক কাজী সিরাজ যথাক্রমে এর সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক মনোনীত হন।[৭১] এই সংগঠনের কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক পরিচয় স্পষ্ট ছিল না। এ দু'জন ছাড়া অন্যান্য কর্মকর্তার নামও পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। তবে সৌদি স্বীকৃতির পর স্বাধীনতা বিরোধী একটি মহলের সম্পৃক্ততার ভেতর দিয়ে এই সংগঠনটির পরিপূর্ণ সাংগঠিত রূপ লাভ করে।

১৯৭৪ সালে সংগঠিত কূটনৈতিক উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশের অনেকেই আশাবাদী ছিলেন ১৯৭৫ সালের প্রথম দিকেই সৌদি স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করবে। অবশ্য পচাত্তরের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানি একটি চক্রান্ত সম্পর্কে ভুট্টোর জীবনী লেখক স্ট্যানলি উলপার্ট উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ভুট্টো সৌদি আরবে বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা চালানোর জন্য আব্দুল মালেককে সৌদি পাঠান। ১৯৭৫ সালের ২২ জানুয়ারি মালেক ভুট্টোকে চিঠি লেখেন। চিঠিতে ভুট্টোকে 'আমার প্রিয় নেতা' সম্বোধন

করে বলেন, বাংলাদেশের ৬.৫ মিলিয়ন মুসলমান তাদের মুক্তির জন্য আপনার দিক নির্দেশনা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য গভীর উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে। এ চিঠি প্রাপ্তির পর পরই ভুট্টো ধর্মমন্ত্রী মওলানা কায়সার নিয়াজীকে সৌদি ও আরব আমিরাতে পাঠান। এ সফরের উদ্দেশ্য ছিল সংশ্লিষ্ট দেশের কুটনৈতিক, সাহায্য তথা অস্ত্রের যোগান নিশ্চিত করা। ভুট্টো ভেবেছিলেন এদের মাধ্যমে বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন করে 'ইসলামিক রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' অথবা ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সমন্বয়ে 'উপদেষ্টা কাউন্সিল' গঠনের জন্য চাপ সৃষ্টি করা যাবে।[৭২] অবশ্য নিয়াজি ও মালেক মিশনের প্রতি সৌদি বাদশাহ বা সরকারি যোগাযোগ ও প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কোন উৎস থেকে বিস্তারিত জানা যায় না। ভুট্টোর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠজন বলে খ্যাত উলপাটের এই বক্তব্যের সত্যতা থাকাই স্বাভাবিক। তবে এ ঘটনার মাত্র ২ মাস পর সৌদি আরবের রাজনৈতিক পট আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে এ ব্যাপারটি হয়তো বেশি দূর অগ্রসর হয় নি। ২৫ মার্চ বাদশাহ ফয়সল তাঁর ভ্রাতুস্পুত্র শাহজাদা মুসায়েদ কর্তৃক নিহত হন। পরের দিনই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সৌদি আরবে এক শোকবানী প্রেরণ করেন। ঐদিন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় ২৭ মার্চ বাংলাদেশের সরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে।[৭৩] তথ্যমন্ত্রী কোরবান আলী এক শোক বাণীতে বলেন, বাদশাহর মৃত্যুতে পৃথিবী একজন মহান নেতাকে হারিয়েছে। তিনি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশকে মধ্যযুগীয় অবস্থা থেকে উত্তোরণ ঘটিয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে ছিলেন।[৭৪] ২৬ মার্চ টাঙ্গাইলের সন্তোষ থেকে প্রেরিত এক বাণীতে মওলানা ভাসানী তাঁর মৃত্যুতে মুসলিম জাহানের অপূরণীয় ক্ষতি বলে উল্লেখ করেন।[৭৫] বিভিন্ন মসজিদে গায়েবেনা জানাজা ও বিশেষ মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাদশাহর জীবনী ও কর্মধারা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন বঙ্গবন্ধুর শোকবাণী নিয়ে ১৯৭৫ সালের মে মাসে সৌদি আরব সফর করেন। ১২ মে সৌদি বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি শোকবাণী হস্তান্তর করেন। এই বাণীতে বঙ্গবন্ধু বাদশাহর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ এবং নতুন বাদশাহ খালেদকে অভিনন্দন জানান। ডঃ কামাল এই সাক্ষাৎকারে বাদশাহ ফয়সালের মৃত্যুতে বাংলাদেশের পতাকা অর্ধনমিত করে শোক পালন, বাদশাহর আত্মার মাগফেরাত কামনা কনে মোনাজাত, জানাজার বিষয় উল্লেখ করেন। এ বৈঠক প্রায় আধা ঘন্টা স্থায়ী হয়। বঙ্গবন্ধুর এই শোকবাণী ও ডঃ কামাল হোসেনের সৌদি সফর স্বীকৃতির বিষয় একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হয়। এর ফলে বাদশাহ খালেদ সরকারের

কাছে বাংলাদেশের অবস্থান, সৌদি আরবের সঙ্গে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব স্থাপনের আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

যদিও এটি ঠিক বাদশাহ ফয়সালের মৃত্যু স্বীকৃতির বিষয়টিকে কিছুটা হলেও প্রলম্বিত করেছে। এ অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সৌদি রাজ পরিবার তথা অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি পররাষ্ট্রনীতিতে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছে। ১৯৭৪ সালের মধ্যেই বাংলাদেশের ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে স্বীকৃতির বিষয়টি ছিল শুধু একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। লন্ডনে মধ্যপ্রাচ্যের নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে ১৯৭৫ সালের এপ্রিলের প্রথম দিকে প্রকাশিত এক তথ্যে বলা হয় সৌদি স্বীকৃতি এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। বাংলাদেশে এই তথ্যকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। সৌদি আরবের বাদশাহকে শোকবাণী প্রেরণ ছাড়াও বাংলাদেশ এই দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ অব্যাহত রাখে। সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সৌদি আল ফয়সালের মন্ত্রী গ্রহণ উপলক্ষে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রেরিত এক বাণীর জবাবে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী পত্র প্রেরণ করেন তা থেকে সৌদি মনোভাব ও স্বীকৃতির বিষয়টি প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন, আরব ও ইসলামী বিশ্বের কল্যাণ ও গৌরবের স্বার্থে ইসলামিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠবে।

১৯৭৫ সালের ১২-১৫ জুলাই জেদ্দার ইসলামী পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলনে ডঃ কামাল হোসেন যোগ দেন। তাঁর সঙ্গে সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক হয়। বৈঠকে সৌদি আরব দু'টি দিক প্রাধান্য দেয় ১. পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ও ২. সৌদি আরবের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের অনমনীয় মনোভাবের উল্লেখ করেন। বাদশাহ খালেদ এ বিষয়ে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সন্তোষজনক মীমাংসার বিষয়ে জোর দেন। ইতোমধ্যে ১৯৭৫ সালের মে মাসে জামাইকাতে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ সম্মেলনে বাংলাদেশ সম্পদ বন্টন ইস্যুটি উপস্থাপন করে। অনেক সদস্য বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। জেদ্দা সম্মেলনে বাংলাদেশের উদ্যোগে সম্পদ বন্টন ইস্যুতে কোন প্রস্তাব নেয়া হতে পারে এমন আশংকায় পাকিস্তান একটি শক্তিশালী দল জেদ্দা পাঠায়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমদ ছাড়াও সচিব ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এতে অংশ নেন। অথচ বাংলাদেশ সৌদি আরবের এ মনোভাবের কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যতো দিন সৌদি স্বীকৃতি পাওয়া না যাবে ততদিন ওআইসি এর সম্মেলনে বিষয়টি তোলা হবে না।[৭৬] বাংলাদেশ উদ্যোগ না নিলেও কমনওয়েলথ সম্মেলনের কয়েকটি আরব দেশ এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়। ইউএই(UAE) এর তেলমন্ত্রী ওতেইবা (oteiba) এ উদ্দেশে ১৮ জুন ঢাকা

সফর শেষে পাকিস্তান যান। তেলমন্ত্রীর সফর ও স্বীকৃতির ব্যাপারে ইতিবাচক আলোচনার পর কূটনৈতিক মহলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জেদ্দা সম্মেলনের পর সৌদি স্বীকৃতি পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে দুটো ঘটনা উল্লেখ করা যায়, প্রথমত ডঃ কামাল হোসেনকে জেদ্দা সম্মেলনে অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়। সৌদি পররাষ্টমন্ত্রীর দেয়া ভোজসভায় কেন্দ্রীয় আসনটি তাঁর জন্য বরাদ্দ করা হয়। অথচ সম্মেলনের রীতি অনুযায়ী ঐ আসনে সিনিয়র পররাষ্টমন্ত্রীকে বসানো হয়। ডঃ কামাল জ্যেষ্ঠ পররাষ্টমন্ত্রী ছিলেন না। জ্যেষ্ঠ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ডঃ আদম মালিক। দ্বিতীয়ত, পরলোকগত বাদশাহ ফয়সলের সঙ্গে মন্ত্রী, দূত পর্যায়ে বৈঠকে তিনি বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজনের বিষয়টিতে বার বার আপত্তি উত্থাপন করে আসছিলেন। কিন্তু নতুন সৌদি প্রশাসন এবিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করেনি। এ বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন।[৭৭] জেদ্দা সম্মেলনে যোগদানকারী ফখরুদ্দীন আহমদ সৌদি মনোভাব সম্পর্কে বলেন, আমার মনে হয়েছে সৌদি স্বীকৃতি পেতে আরো অন্তত: ৩/৪ মাস সময় নিবে। কারণ পাকিস্তানের সংগে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক তখনো স্থাপিত হয় নি। পাকিস্তানের সঙ্গে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা পর্যন্ত বাংলাদেশের উপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সৌদি আরব এ সময় নেবে। জেদ্দা সম্মেলনে পরের মাসেই অর্থাৎ আগষ্টের তৃতীয় সপ্তাহে ডঃ কামালের সঙ্গে স্বীকৃতির বিষয় সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পুনরায় বৈঠক হওয়ার কথা ছিল।[৭৮] জেদ্দা সম্মেলনে আলোচনাকালে একটি বিষয় অগ্রগতি লাভ করে যে ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবের হজ্বব্রত পালনের জন্য সৌদি আরব যাবেন এবং এর আগেই সৌদি আরব স্বীকৃতি দিবে।[৭৯] কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট তাঁর হত্যাকান্ডের ফলে তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি।

সৌদি সরকার অবশ্য ১৯৭২ সালে পাকিস্তানকে দেয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল। পাকিস্তান ১৫ আগষ্ট মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়ার পর ১৬ আগষ্ট সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। সৌদি বাদশাহ খালেদ প্রেসিডেন্ট মোশতাককে প্রেরিত এক অভিনন্দন বাণীতে নতুন সরকারের সঙ্গে দৃঢ়তর ইসলামী সংহতি ঘোষণা এবং বাংলাদেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।[৮০]

উল্লেখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সৌদি আরব সম্পর্ক মূলত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টার পর্যায় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ নিজস্ব জাতীয় স্বার্থে বিশেষ করে অর্থনৈতিক (পেট্রোডলার ও জনশক্তি রপ্তানি) এবং ধর্মীয় কারণে

(হাজীদের ফেরৎ আনা ও হাজীদের প্রেরণ) এবং রাজনৈতিক কারণে (স্বীকৃতি লাভ) সৌদি আরবের সঙ্গে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিল। অন্যদিকে সৌদি আরব তথা আরব বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের নৈতিক/কূটনৈতিক সমর্থন বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু আরব বিশ্বের সকল সমস্যায় (যেমন ১৯৭৩ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধ, প্যালেস্টাইন সমস্যা) বাংলাদেশ সমর্থন দিলেও সৌদি আরবের সংগে সম্পর্কের ক্ষেত্রে মুজিব আমলে বাংলাদেশের জাতীয় স্বার্থ বহুলাংশেই পূরণ হয় নি। বাংলাদেশের ব্যাপারে পাকিস্তান নির্ভর সৌদি পররাষ্ট্রনীতি বাংলাদেশ সৌদি সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বাঁধা হয়ে দেখা দেয়।

এ ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৯৭৪ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলেও বাংলাদেশের সংগে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নি। বাংলাদেশের সংগে পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে পাকিস্তানের একনিষ্ঠ মিত্র সৌদি আরব ও চীন স্বীকৃতি দিবে না এমন একটি ধারনা বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ মিত্র রাষ্ট্রগুলো এমন কি পশ্চিমা গণমাধ্যম থেকে পাওয়া গিয়েছিল। পাকিস্তানের উপর সৌদি আরবের সামরিক নির্ভরশীলতা এর পিছনে প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এক হিসাবে দেখা যায় ১৯৭৩-৭৪ সালে সৌদি আরবে ৪০০০ পাকিস্তানি সৈন্য ও বিমান সেনা কর্মরত ছিলেন এবং তাদের জন্য সৌদি বার্ষিক খরচ ছিল ১০ মিলিয়ন ডলার।[৮১] এই নির্ভরশীলতার কারণেই সৌদি আরব বাংলাদেশ হারানোর বেদনায় বেদনাহত পাকিস্তানের পাশে এসে দাড়ায় এবং ওআইসি, আরব লীগ, জাতিসংঘসহ সর্বত্র পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভূমিকা রাখে। পাকিস্তানকে নৈতিক, আর্থিক, সামরিক সহযোগিতার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার জন্য সৌদি ভূমিকার সঠিক চিত্র ফুটে ওঠে ১৯৬৯-১৯৭৫ পর্যন্ত সৌদি-পাকিস্তান বাণিজ্যের খতিয়ান থেকে।

সারণি: ২

পাকিস্তান-সৌদি বাণিজ্য ১৯৬৯-৭৫

মিলিয়ন রুপীতে

সন	পাকিস্তানের আমদানী	পাকিস্তানের রপ্তানী	বানিজ্যের ভারসাম্যতা
১৯৬৯-৭০	৩৪.৭	৪০.৪	৬.১
১৯৭০-৭১	৩৭.৯	৩৯.৪	৮.৫
১৯৭১-৭২	৯২.০	৮২.২	৯.৪
১৯৭২-৭৩	৩৬৫.৯	১২৯.০	২৩৬.৯
১৯৭৩-৭৪	৮৯২.৯	৩৯৮.৫	৪৯৪.৪
১৯৭৪-৭৫	১৫৫৯.১	৬২১.৯	৯৩৭.২

উৎস : *Pattern of Foreign Trade of Pakistan* (Karachi: 1984) p.215.

উল্লেখিত সারণি থেকে দেখা যায় ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের তুলনায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর সৌদি -পাক বাণিজ্য প্রতি বছর প্রায় ৫০%-১০০% বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭১ - ৭২ বছরের দু'দেশের আমদানী রপ্তানী ছিল ১৭৪.২ মি: রুপি তা ১৯৭৪-৭৫ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৭০.১০ মিলিয়ন রুপিতে উন্নীত হয়।

অন্যদিকে ইসলামী আদর্শ, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের গলাভরা বক্তব্য দিলেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে কিংবা ১৯৭৩-৭৪ সালে খাদ্য সংকট, তৈল সংকটে পতিত বাংলাদেশে বহু আবেদন ও অনুরোধ সত্বেও সৌদি আরবসহ আরব বিশ্ব তেমন সাড়া দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করে নি। ওআইসি'র সদস্য হয়েও বাংলাদেশ সংকটকালে মুসলিম বিশ্বের ধনী দেশগুলোর কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছে তা পশ্চিমা ও অন্যান্য দাতা দেশগুলোর তুলনায় খুবই নগন্য। ১৯৭১-৭৫ পর্যন্ত সৌদি সহ অন্যান্য মুসলিম দেশ কর্তৃক বাংলাদেশকে প্রদত্ত সাহায্য ও ঋণ হচ্ছে মাত্র ৭৮.৯ মিলিয়ন ডলার। আর এ সময় শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই ৩৭৯.৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য ও ঋণ দেয়।[৮২]

এর থেকে দেখা যায় বাংলাদেশকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত সৌদি আরব মুসলমান দেশ ও ওপেক দিয়েছে মাত্র ৭৮.৯ মিলিয়ন ডলার সাহায্য। অন্য দিকে এসময় পাকিস্তান পেয়েছে ৭৮৩.৬৫ মিলিয়ন ডলার সাহায্য (সারণি: ৩)

সারণি: ৩

মুসলিম দেশ কর্তৃক পাকিস্তানের প্রাপ্ত ঋণ সংখ্যা

ঋণের প্রকৃতি	সাহায্য ঋণের পরিমান (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
সৌদি প্রকল্প ঋণ	১৩০.০০
সৌদি দুর্যোগ সাহায্য	১০.০০
ওপেক সাহায্য	৬২২.০০
ওপেক বিশেষ সাহায্য	২১.৬৫
মোট সাহায্য	৭৮৩.৬৫

উৎস ঃ *Pattern of Foreign trade of Pakistan* (Karachi. 1984).

দুদেশের জনশক্তি রপ্তানি ক্ষেত্রে দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশের ২০,০০০ লোক স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে অবস্থান করছিলেন এবং ১৯৭২-৭৫ সালে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কোন বাঙালি মধ্যপ্রাচ্যে যাওয়ার সুযোগ পায় নি। অন্যদিকে এসময় শুধু সৌদি আরবে ১৯৭৪ পর্যন্ত ৩৫,০০০ এবং মধ্যপ্রাচ্যে ১ লক্ষ ৭০ হাজার পাকিস্তানি কর্মরত ছিলেন।[৮৩] ১৯৭৩-৭৪ অর্থ বছরে সৌদি আরব

থেকে প্রবাসী পাকিস্তানীদের প্রেরিত অর্থের পরিমান ছিল ৭.৮৭ মিলিয়ন রুপি এবং ১৯৭৭-৭৮ অর্থ বছরে তা বেড়ে গিয়ে ৪৬৪.১০ মিলিয়ন রুপিতে দাড়ায়।[৮৪]

সাদৃশ্য, সাংস্কৃতিক মিলের কারণে বাংলাদেশের চেয়ে পাকিস্তান সৌদি আরবের বিবেচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। পাকিস্তানের সংগে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের আগে তাই সৌদি আরব স্বীকৃতি দেয় নি। ১৯৭৪ সালে ১ কোটি ডলার বন্যা দূর্গতদের জন্য সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের ভাগ্যে সৌদি কোন অর্থ সাহায্য জুটেনি। দু'দেশের মধ্যে মুজিব আমলে কোন আমদানি রফতানি হয় নি। অথচ ১৯৭২-৭৩ সালে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, তেল সংকটের কারণেই বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। অবশ্য মুজিব আমলে এর সুফল না পাওয়া গেলেও এর সাফল্য ভোগ করেছিল তাঁর উত্তরসুরি শাসকগণ। ১৯৭৫ পরবর্তী ক্ষমতাসীন সরকারগুলোর সংগে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ট হয়। যদিও এক্ষেত্রে তাদের কৃতিত্ব ছিল খুবই কম। তাদের অভিনবত্ব কিছুই ছিল না বা সম্পূর্ণভাবে আকস্মিক কোন পরিবর্তন তাঁরা আনে নি। মুজিব যা করতে চেয়েছিলেন বা শুরু করেছিলেন তাই তারা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন মাত্র। মুজিব পরবর্তীকালে এক্ষেত্রে যা অগ্রগতি তাহলো মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের সেতু বন্ধন নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।[৮৫] জেনারেল জিয়া মুজিব আমলের সংবিধানের চার মূলনীতি থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র উচ্ছেদ করেন এবং সংবিধানে ইসলামী সংহতির ভিত্তিতে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক সংহত, সংরক্ষণ ও জোরদার করার কথা ঘোষণা করেন।[৮৬] অবশ্য মুজিবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির এই পরিবর্তনের কারণে সৌদি আরবসহ মুসলিম বিশ্বের আর্থিক সমর্থন পেতে সময় লাগে নি। ১৯৭৫ সালের ১৬ আগষ্ট স্বীকৃতির পর থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত সৌদি আরব বাংলাদেশকে ১৮ মাসে ৩১৭ কোটি টাকা সাহায্য দেয়।[৮৭] পরের বছরগুলোতে এই সাহায্য আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথচ মুজিব আমলে সংবিধানে এই কথাটি সংযুক্ত না হলেও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক বিকশিত হয়। তবে মুজিব মুসলিম বিশ্বের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে বহাল রেখেই অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের সংগে সম্পর্ক স্থাপন করেন। আর এটিই ছিল তাঁর পররাষ্ট্রনীতির বড় সাফল্য। তাই দেখা যায় বাংলাদেশ-সৌদি আরব সম্পর্কের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, ও ধর্মীয় নির্ধারকই মুজিব আমল ও মুজিব পরবর্তীতে ক্রিয়াশীল রয়েছে। আর ভবিষ্যতে কোন কারণে সৌদি আর্থিক সহযোগিতা বন্ধ হলেও মক্কা-মদিনার ধর্মীয় গুরুত্বের কারণে বাংলাদেশের সঙ্গে সৌদি আরবের সম্পর্ক বহাল থাকবে।

পরিশিষ্ট

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদাণকারী মুসলিম এবং ওআইসিভূক্ত রাষ্ট্র (১৯৭২-৭৫)

দেশ	তারিখ
রিপাবলিক অব সেনেগাল	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া/মালয়েশিয়া	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২
রিপাবলিক অব গাম্বিয়া	২ মার্চ ১৯৭২
রিপাবলিক অব গ্যাবন	৬ এপ্রিল ১৯৭২
দি মালদ্বীপ রিপাবলিক	১২ এপ্রিল ১৯৭২
রিপাবলিক অব সিয়েরালিউন	২২ এপ্রিল ১৯৭২
রিপাবলিক অব ইরাক	৮ জুলাই ১৯৭২
পিপলস ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন	৩১ জুলাই ১৯৭২
রিপাবলিক অব উগান্ডা	১৬ আগষ্ট ১৯৭২
আপার ভল্টা	১৯ আগষ্ট ১৯৭২
ডেমোক্রাটিক রিপাবলিক অব আফগানিস্তান	১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩
রিপাবলিক অব লেবানন	২৮ মার্চ ১৯৭৩
কিংডাম অব মরক্কো	১৩ জুলাই ১৯৭৩
ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব আলজেরিয়া/ ইসলামিক রিপাবলিক অব মৌরিতানিয়া/ রিপাবলিক অব তিউনিশিয়া	১৬ জুলাই ১৯৭৩ ৮ সেপ্টের ১৯৭৩
আরব রিপাবলিক অব ইজিপ্ট /সিরিয়ান আরব রিপাবলিক	১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
সোসালিষ্ট পিপলস লিবিয়ান আরব জামাহিরিয়া	১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
রিপাবলিক অব নাইজার	২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
রিপাবলিক অব গিনি বিসাউ	৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩
ইউনাইটেড রিপাবলিক অব ক্যামেরুন	৬ অক্টোবর ১৯৭৩
রিভ্যুলিউশাণরি পিপলস রিপাবলিক অব গিনি	১০ অক্টোবর ১৯৭৩
কিংডাম অব জর্ডান	১৬ অক্টোবর ১৯৭৩
ষ্টেট অব কুয়েত	৪ নভেম্বর ১৯৭৩
ইসলামিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন	৫ নভেম্বর ১৯৭৩
ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান/ রিপাবলিক অব তুর্কি /ইরান	২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
ফেডারেল রিপাবলিক অব নাইজারিয়া	২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪
ষ্টেট অব কাতার	৪ মার্চ ১৯৭৪
ষ্টেট অব দি ইউনাইটেড আরব আমিরাত	১০ মার্চ ১৯৭৪
ষ্টেট অব বাহরাইন	৮ জুন ১৯৭৪
কিংডাম অব সৌদি আরব ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব সুদান	১৬ আগষ্ট ১৯৭৫

উৎস : সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: ১৯৮৫); Nurul Momen, *Bangladesh The First Four Years* (Dhaka: 1980); Syed Tayyeb-ur-Rahman; *Global Geo Strategy of Bangladesh, OIC and Islamic Ummah* (Dhaka: 1985) এবং ১৯৭২ -৭৫ সালের বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা।

তথ্যনির্দেশ

১. *The Times* (London), 15 January 1972 .

২. *The Bangladesh Observer*, 14 January 1972.

৩. দ্রষ্টব্য *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* (ঢাকা: তারিখ উল্লেখ নেই) পৃ: ৭।

৪. MERI Report Saudi Arabia (London: 1985), p. 34. সৌদি আরবের সঙ্গে মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Abdullah Omar Nassief, *The Emergence of Islamic solidarity the role of Saudi Arabia*, in Saudi Arabia its place in the World (Riyadh: N), pp. 105-106 .

৫. Pradyumna P. Karan, 'Indian`s Role in Geo-politics, in K.P Misra (ed), *Studies in Indian Foreign Policy* (New Delhi: 1969), p. 34. এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা* (ঢাকা:১৯৮২),পৃ: ৯-১১।

৬. সৌদি আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Fouad Al-Farsy, *Modernity and Tradition the Saudi: Equation* (London: 1990), pp 1-2.

৭. Greorge Lipsky, *Saudi Arabia Its People, Its Society, Its Culture* (New Haven: 1959), p. 19

৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য Syed Tayyeb-ur-Rahman, *Global Geo-Strategy of Bangladesh, OIC and Islamic Ummah* (Dhaka: 1985), pp. 43-45.

৯. Abul Kalam (ed.) *Bangladesh International dynamies and external linkages* (Dhaka: 1996), p. 310.

১০. Khalida Qureshi, 'Pakistan and Middle East', *Pakistan Horizn*, vol xx, no. 23, Second quarter, 1966, p. 156.

১১. Surendra Chopra, *Perspectives on Pakistans Foreign policy* (Amritsar: 1983) p. 348.

১২. Mohammad Ahsan Choudhuri, 'Pakistan and the Muslim world', *Pakistan Horizon*, vol. X, no.3, September 1957, p. 158.

১৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৩ এপ্রিল ১৯৭১।

১৪. *The Pakistan Times* (Karachi), 9 April 1971.

১৫. *The Dawn* (Karachi), 29 April 1971.

১৬. *IDSA News Review on Pakistan* (Delhi: IDSA), April 1971, p. 27.

১৭. *The Pakistan Observer* (Karachi), 15 May 1971.

১৮. *Morning News* (Karachi), 8 September 1971.

১৯. *Financial Times* (London), 19 October 1971.

২০. *Pakistan Horizon*, chronology vol. XXV, no. 1, 1972, p.177.

২১. *দৈনিক আজাদ*, ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১।

২২. Naveed Ahmed, 'Pakistan-Saudi Arab' in Verinder Grover and Ranjana Arora, *Political System in Pakistan*, vol. 8, (New Delhi: 1995), p. 220.

২৩. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ ।

২৪. *Pakistan Horizon*, op. cit. p. 112.

২৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, 'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণে বঙ্গবন্ধুর অবদান', *অগ্রপথিক*, আগষ্ট ১৯৯৭, পৃ: ৪০।

২৬. যে মাসে সফরকারী দেশগুলো হচ্ছে (১) কুয়েত (২) আরব আমিরাত (৩) ইরাক (৪) লেবানন (৫) জর্ডান (৬) সৌদি আরব (৭) সোমালিয়া (৮) ইথিওপিয়া (৯) সুদান (১০) নাইজেরিয়া (১১) গুয়েনা (১২) মরিতানিয়া (১৩) তুরস্ক (১৪) ইরান, অবশ্য এর মধ্যে কেবল ইরাক ১৯৭২ সালের জুলাইয়ে স্বীকৃতি দেয়। এসব দেশে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য Lawrence Ziring, "Bhutto's Foreign Policy 1972-1973, in J. Henry Korson, *Contemporary Problems of Pakistan"* (Netherland: 1974), pp. 61-65.

২৭. Zubeda Mustafa, 'Recent trands in Pakistan Foreign Policy towards the Middle East' , *Pakistan Horizon*, vol. XXVII. No. IV, 1975. pp. 6-7.

২৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *ইসলামী বিশ্ব ও বাংলাদেশ* (ঢাকা: ১৯৮৫) পৃ: ১৫। বাংলাদেশ-মুসলিম বিশ্ব নির্ধারক অংশের জন্য এ গ্রন্থটির সহযোগিতা নেয়া হয়েছে। প্রবন্ধকারদ্বয় তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

২৯. *Bangladesh Observer*, 19 September 1974.

৩০. The Ralph Braibani, "Saudi Arabia in the context of Political development and theory'', in William A. Beling, *King Faisal and the Moernisation of Saudi Arabia* (London: 1980) pp. 45 -46.

৩১. Amitava Mukherjee, *Saudi Arabia: The Land beyond Time* (Delhi: 1967) p. 49.

৩২. *The Bangladesh Observer*, 28 May 1972.

৩৩. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ: ২০।

৩৪. *দৈনিক সংবাদ*, ২৪ নভেম্বর ১৯৭৫।

৩৫. *The Pakistan Times*, 21 December, 1971.
৩৬. *The Dawn*, 23 December, 1971.

৩৭. সৌদি আরব ও পাকিস্তানে পুনর্বাসিত স্বাধীনতা বিরোধীদের তালিকার জন্য দ্রষ্টব্য- এ.এস, সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান* (ঢাকা: ১৯৯৫), পৃ: ৩৮৪-৪৩৩। আরো দ্রষ্টব্য, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়* (ঢাকা: ১৯৮৭),পৃ:১৭৯- ১৯১।

৩৮. *দৈনিক বাংলা*, ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২।

৩৯. ঐ

৪০. ঐ

৪১. ঐ, ২ মার্চ ১৯৭২।

৪২. ঐ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭২।

৪৩. *The Bangladesh Observer*, 7 October 1972

৪৪. সৈয়দ আলম খান, 'সৌদি আরবে বাংলাদেশের প্রতি অনুভূতি', *দৈনিক বাংলা*, ১০ মার্চ ১৯৭৩।

৪৫. *দৈনিক জনপদ*, ২১ জানুয়ারি ১৯৭৩।

৪৬. *The Morning News*, 3 January 1973.

৪৭. The pakistan Times, 27 January 1973.

৪৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত পৃ: ৩৫-৩৬।

৪৯. *The Guardian*, 3 December 1973.

৫০. সাক্ষাৎকার মওলানা আবদুল আউয়াল, (মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ) সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১৮ মে ১৯৯৭।

৫১. *The Dawn*, 3 January 1973.

৫২. মওলানা আউয়াল, পূর্বোক্ত।

৫৩. *দৈনিক বাংলা*, ৩ মে ১৯৭২।

৫৪. ঐ

৫৫. *দৈনিক আজাদ*, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭৪

৫৬. *Pakistan Horizon*, vol. XXV, no. 1, 1972. p.133.

৫৭. "Declarations and Resolutions on Political and Information Affair Conference of the Organisation of the Islamic Conference 1969-1980" (Islamabad , n.d.), p. 44.

৫৮. *দৈনিক আজাদ*, ১৬ মার্চ ১৯৭২।

৫৯. *The Pakistan Times*, March 2 1972.

৬০. Fakhruddin Ahmed, *Critical times Memoirs of a South Asian Diplomat* (Dhaka: 1994), pp. 195 - 196.

৬১. এম. আর. আখতার মুকুল, *মুজিবের রক্তলাল* (ঢাকা: ১৯৮৯), পৃ: ৩৮-৪১।

৬২. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, পূর্বোক্ত অগ্রপথিক, পৃ: ৪৬।

৬৩. Fakhruddin Ahmed, *op.cit.*, p. 105.

৬৪. *The People,* 19 April 1974.

৬৫. *দৈনিক আজাদ*, ২৭ আগষ্ট ১৯৭৪।

৬৬. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

৬৭. *দৈনিক ইত্তেফাক* ,১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪।

৬৮. *দৈনিক বাংলা*, ৭ নভেম্বর ১৯৭৪।

৬৯. *The Bangladesh Times*, 15 November 1974.

৭০. *দৈনিক আজাদ*, ৮ নভেম্বর ১৯৭৪।

৭১. *The Morning News*, 23 November 1974.

৭২. Stanley Wolpert, *Zulfi Bhutto of Pakistan: His life and Times* (Delhi:1993), p. 248

৭৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৭ মার্চ ১৯৭৫।

৭৪. *The Bangladesh Ovserver*, 28 March 1975.

৭৫. *I bid*, 29 March 1975.

৭৬. Fakhruddin Ahamed, *op. cit.*, pp. 136-137.

৭৭. *Ibid.* p. 138.

৭৮. সরদার সিরাজুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ* (চট্টগ্রাম: ১৯৮৯) পৃ: ১৪-১৫।

৭৯. মওলানা আব্দুল আউয়াল, পূর্বোক্ত।

৮০. দৈনিক বাংলা, ১৮ আগষ্ট ১৯৭৫।

৮১. *The Sunday Times* (London), February 3 1974.

৮২. *Flow of External Resources in Bangladesh* (Dhaka: 1981), pp. 20-22, 26-27.

৮৩. *The Dawn*, 12 February 1976. ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত পাকিস্তানির সংখ্যা দাড়ায় আড়াই লক্ষ। দ্রষ্টব্য The Dawn, 20 July 1977.

৮৪. Mohmmad Nishat and Nighat Bilgami, 'The impact of Migrant worker's Remittances on Pakistan', *Pakistan Economic and Social Science*, vol. XXX, no. 1 Summer, 1991, p. 35.

৮৫. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *অগ্রপথিক*, প্রাগুক্ত।

৮৬. *গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান* ১৯৭৯ (ঢাকা: তারিখ উল্লেখ নেই) পৃ: ৮।

৮৭. *দৈনিক আজাদ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭।